এইচ এস সি সমাজকর্ম

অধ্যায়-৫: সামাজিক আইন এবং সমাজকর্ম

প্রশ্ন ▶১ বিয়ের পর অনেক আশা করে রিমি শ্বশুরবাড়ি এসেছিল। তার স্বামী গাঁজা আর ফেনসিডিল ব্যবসার সাথে জড়িত। প্রায়ই সে নেশাগ্রস্ত হয়ে রাতে এসে রিমির ওপর ভীষণ অত্যাচার নির্যাতন চালায়।

[চা. বো, য. বো, সি. বো, দি. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৬]

ক. আইনানুযায়ী এ দেশের মেয়েদের বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স কত? ১

খ. সামাজিক আইন বলতে কী বোঝ? ২

গ. স্বামীর অত্যাচার নির্যাতনের জন্য সুবিচার পেতে যে আইনের সাহায্য রিমি গ্রহণ করতে পারে তার প্রধান ধারা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. রিমির অত্যাচারী স্বামীর ব্যবসার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রযোজ্য আইনের কার্যকারিতা বাংলাদেশের সাপেক্ষে মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইনানুযায়ী এ দেশের মেয়েদের বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর।

খ সমাজ থেকে অবাঞ্ছিত অবস্থা দূর করে সুন্দর, সুষ্ঠু ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলার জন্য যে সকল আইন প্রণয়ন করা হয় সেগুলোই সামাজিক আইন।

নাগরিকের সামগ্রিক কল্যাণে রাষ্ট্র কর্তৃক নানা ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়। এ সকল আইন নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যে পরিবর্তন আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ আইনগুলোর মাঝে জনকল্যাণ সম্পর্কিত আইন হচ্ছে সামাজিক আইন। মূলত সমাজের স্বাভাবিক গতিধারাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয় তাই সামাজিক আইন।

গ স্বামীর অত্যাচার ও নির্যাতনের সুবিচার পেতে রিমি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন-২০০৩ এর সাহায্য নিতে পারে।

নারী নির্যাতন রোধ এবং অপরাধীকে কঠোর শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত আলাদা আলাদা অনেক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালে প্রণীত মূল আইনের সংশোধনী এনে ১৩ জুলাই ২০০৩ সালে পাস করা হয় 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধনী) আইন-২০০৩'। এই আইনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১২টি অনুচ্ছেদ ও উপ-অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনা হয়েছে এবং অপরাধের বিচার ও তদন্ত সম্পর্কিত ছয়টি নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে।

উদ্দীপকের রিমি স্বামীর অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধনী) আইন-২০০৩' এর সাহায্য নিতে পারে। এ আইনে নারী নির্যাতন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রত্যয়ের (যেমন- অপরাধ, অপহরণ, আটক, ধর্ষণ, নবজাতক শিশু, যৌতুক প্রভৃতি) সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সেইসাথে এর প্রধান ধারাগুলোর মধ্যে আছে- ১. শিশুর বয়স নির্ধারণ– সংশোধিত আইনে শিশুর বয়সসীমা ১৪ বছর থেকে বাড়িয়ে ১৬ বছর করা হয়েছে; ২.দহনকারী পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি- যদি কোনো ব্যক্তি দহনকারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দিয়ে কোনো শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান বা ঘটানোর চেষ্টা করেন তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড হবে। এছাড়া নির্যাতনের কারণে নারী বা শিশুর অঙ্গহানি ঘটলে বা শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনো ক্ষতি হলে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে; ৩. মুক্তিপণ আদায় করার শাস্তি- মুক্তিপণ আদায় করার উদ্দেশ্যে যদি কোনো শিশু বা নারীকে আটক করা হয় তাহলে আটককারীর মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এমনকি অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে; ৪. নারী ও শিশু অপহরণ- পতিতাবৃত্তি বা নীতিবহির্ভূত কাজে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে কোনো নারী ও শিশু পাচার করা হলে নিয়োজিত ব্যক্তির শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অন্যূন ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ড হবে; ৫. সম্ভ্রমহানিজনিত কারণে আত্মহত্যা- আইন অনুযায়ী সম্ভ্রমহানির পর কোনো নারী আত্মহত্যা করলে বা কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সর্বোচ্চ ১০ বছর অথবা নূন্যতম পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হবে। তবে এ আইনের আরো কিছু ধারা রয়েছে যেগুলো রিমির মতো নির্যাতনের শিকার নারীদের সুবিচার পেতে সাহায্য করবে।

ঘ রিমির অত্যাচারী স্বামীর ব্যবসার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য '১৯৮৯ সালের মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ' প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এ অধ্যাদেশের ভিত্তিতে প্রণীত আইনের কার্যকারিতা রয়েছে।

১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার মাদকের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে এবং সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮৬ সালের ২২ ডিসেম্বর মাদকদ্রব্য বিরোধী জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি প্রচলিত মাদকদ্রব্য আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং নতুন আইন প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে সুপারিশ পেশ করে। ঐ কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৮৯ সালের ২০ জানুয়ারি জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা ও এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রণীত হয়। অধ্যাদেশ নিয়ে বিভক্তি থাকলেও ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তনের ফলে তা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ করে সমাজকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা দিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এছাড়া আইনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের সাথে মাদকসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কাঠামো (যেমন- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড) ও জনবল সৃষ্টি করা হয়েছে । তবে মাদক পাচারের অন্যতম রুট গোল্ডেন ওয়েজের অন্তর্গত হওয়ায় বাংলাদেশে মাদকের সহজলভ্যতা আশংকাজনকভাবে বাড়ছে। এক্ষেত্রে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ এর সংস্কার করা এখন সময়ের দাবি। এ লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৭ এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে।

সার্বিক আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, মাদক গ্রহণ, কেনা-বেচা এবং চোরাচালান রোধে প্রণীত '১৯৮৯ সালের মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ' এর কার্যকারিতা রয়েছে। তবে সময়ের প্রেক্ষিতে আইনটির সংস্কার এবং এর কঠোর প্রয়োগ ঘটানো জরুরি।

প্রশ্ন ▶২ শরিফার বাবা শরিফার বিবাহের পূর্বে তার হবু জামাতাকে একটি সাইকেল কিনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দারিদ্র্যের কারণে তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি। শরিফার স্বামী এজন্য শরিফাকে মাঝে মাঝে নির্যাতন করছে।

[বি. বো, রা. বো, চ. বো, কু. বো. '১৮। প্রশ্ন নং ৩]

ক. কিশোর আদালত কেন প্রতিষ্ঠা করা হয়? ১

খ. 'আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণের নিয়ন্ত্রক'— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. শরিফার স্বামীর অপরাধ যে সামাজিক আইনের লঙ্ঘন তার পরিচয় দাও। ৩

ঘ. বাংলাদেশে নারী নির্যাতন রোধে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত আইনটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিশোর অপরাধীদের বিচার এবং তাদের আচরণ সংশোধনের জন্য কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়।

Teachingbd24.com

খ আইন সমাজের মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।
সাধারণত বেশিরভাগ সময় সমাজের সবল অংশ দুর্বলদের শোষণ ও নিপীড়ন করার চেষ্টা চালায়। এতে বিভিন্ন রকমের অপরাধ সংঘটিত হয়। তবে যথাযথ আইন ও এর সুষ্ঠু প্রয়োগ মানুষের নেতিবাচক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে অপরাধ হ্রাস করতে পারে। দেশের আইন অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিকে সংশোধিত হতে উৎসাহিত করে। তাই বলা হয়, আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণের নিয়ন্ত্রক।

গ শরীফার স্বামীর অপরাধ যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০ এর লঙ্ঘন, যা একটি সামাজিক আইন ।
যৌতুক একটি সামাজিক কুপ্রথা। এটি নারী তথা সার্বিকভাবে সমাজের উন্নয়নের অন্তরায়। যৌতুক নিরোধ আইন— ১৯৮০ এর মাধ্যমে সামাজিকভাবে এ প্রথা বিলোপের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। তবে উদ্দীপকের শরীফার স্বামীর মতো অনেক পুরুষের ক্ষেত্রে এ আইন না মানার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।
শরীফার বাবা বিয়ের আগে তার হবু জামাতাকে একটি সাইকেল কিনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অর্থাভাবে তিনি সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারায় শরিফাকে নির্যাতিত হতে হয়। অথচ বাংলাদেশের ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনে এ ধরনের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পাশাপাশি এর জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। ঐ আইন অনুযায়ী বিয়েতে কোনো এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষকে কোনো মূল্যবান জামানত দেওয়া বা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া যৌতুক হিসেবে বিবেচিত হবে। কোনো ব্যক্তি যৌতুক দিলে অথবা নিলে অথবা নিতে সাহায্য করলে তাকে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদণ্ড অথবা আর্থিক জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। আইনটিতে আরও বলা হয়েছে এটি কার্যকর হওয়ার পর যৌতুক দেওয়া বা নেওয়া সংক্রান্ত প্রচলিত সব চুক্তি বাতিল হবে।

ঘ বাংলাদেশে নারী নির্যাতন রোধে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত আইন অর্থাৎ যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
প্রতিদিন সংবাদপত্র খুললেই কমবেশি নারী নির্যাতনের খবর চোখে পড়ে। বিবাহিত নারীদের ওপর শারীরিক-মানসিক নির্যাতন ছাড়াও যৌতুকের কারণে সমাজে আরও বিভিন্ন নেতিবাচক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মূলত এ ধরনের নেতিবাচক পরিস্থিতি রোধ করে নারীদের সুরক্ষা দেওয়া এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে এ আইন প্রণীত হয়।
যৌতুকের প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারী ও তার পরিবার। যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে তার সর্বস্ব হারাতে হয়। যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে পরিবারে নানা ধরনের অশান্তি শুরু হয়। প্রায়ই মেয়েরা এ কারণে শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। যৌতুকের কারণে সংগঠিত নানা রকম পরিস্থিতি মোকাবিলা করতেই যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০-তে যৌতুক দেওয়া-নেওয়া ও এ কাজে সহায়তা করার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এমনকি যৌতুক দাবি করার জন্য পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও আর্থিক জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া যৌতুকের জন্য কাউকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করলে ও এ কারণে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। যৌতুকের জন্য অজ্ঞাহানি ঘটালে সাজা হবে যাবজ্জীবন বা কমপক্ষে ১২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। তবে কাগজে-কলমে আইনের ধারাগুলো বেশ শক্ত হলেও যৌতুক প্রথার চল বা যৌতুকজনিত সহিংস ঘটনা প্রত্যাশা অনুযায়ী কমছে না। এর জন্য প্রয়োজন জনসচেতনতা ও আইনের কঠোর প্রয়োগ। মানুষের মধ্যে এ ধারণা দিতে হবে যে যৌতুক চাইলে বা এজন্য নারীকে নির্যাতন করলে শাস্তি ভোগ অবশ্যম্ভাবী।
সার্বিক আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০ এর ভূমিকা অপরিসীম। তবে আইনটি আরও ফলপ্রসূ করতে চাইলে এর কঠোর বাস্তবায়ন দরকার।

প্রশ্ন ▶৩

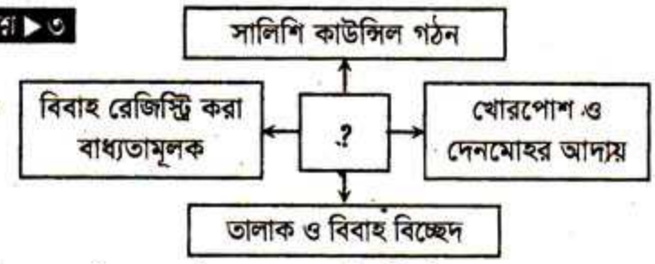

[চা; রা; কু; সি; য, বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫; ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা। প্রশ্ন নং ৫; বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা। প্রশ্ন নং ৫]

ক. আইন কাকে বলে? ১
খ. সামাজিক আইন কীভাবে সামাজিক সমস্যা প্রতিকার ও প্রতিরোধ করে? ২
গ. ছকে প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থানে কোন আইনের নাম লিখলে এ্যারো ছকগুলো হবে তার ধারা? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ছকে উল্লিখিত বিষয়গুলোই কি শুধুমাত্র ঐ আইনের ধারা নাকি আরো ধারা আছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতায় প্রণীত এবং অনুমোদিত বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুনই আইন।

খ সামাজিক আইন অপরাধমূলক সামাজিক সমস্যা নিরসনে শাস্তিমূলক বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে ভূমিকা রাখে।
আমাদের সমাজে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা রয়েছে। যেমন— বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, কিশোর অপরাধ ইত্যাদি। এ সকল সমস্যা সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। এ প্রেক্ষিতে সামাজিক আইন প্রণীত হয় এবং এর যথাযথ প্রয়োগ উক্ত সমস্যাগুলোর প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক আইনে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

গ ছকে প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থানে 'মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১' এর নাম লিখলে এ্যারো ছকগুলো হবে তার ধারা।
কয়েক দশক আগে স্থানীয় মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বেশ আইনি অসামঞ্জস্য ছিল। এজন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার (বর্তমান বাংলাদেশ) নারীর মর্যাদা রক্ষা, অধিকার আদায়, পরিবারের সুখ-শান্তি এবং সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে 'মুসলিম পারিবারিক আইন' কার্যকর করে।
ছকে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইন অনুসারে প্রতিটি বিবাহ রেজিস্ট্রি হতে হবে। বিবাহ রেজিস্ট্রির জন্য ইউনিয়ন কাউন্সিল এক বা একাধিক ব্যক্তিকে লাইসেন্স দেবে। এই ধারাটি মুসলিম বিবাহের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। ছকের সালিশি কাউন্সিল গঠন সম্পর্কিত ধারাটি বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এই সালিশি পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ স্ত্রীর খোরপোশ ও দেনমোহর আদায়ে সালিশি কার্যক্রম চালায়। স্ত্রীর প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী ভরণপোষণ স্বামী দিতে না পারলে সালিশি পরিষদ স্ত্রীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভরণপোষণের অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়। আলোচ্য আইনের তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত ধারাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারা অনুসারে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য স্বামীকে ইউনিয়ন বা পৌর চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত নোটিশ দিতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ৯০ দিন পর তালাক কার্যকর হবে। মূলত বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন নারীর কল্যাণার্থে এক নিরাপত্তা সেফগার্ড হিসেবে পরিচিত।

https://teachingbd24.com

ঘ ছকে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও 'মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১' এর আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারা রয়েছে।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন মহিলা ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। ছকে উল্লেখ করা বিষয়গুলো ছাড়াও এই আইনে দ্বিতীয় বিবাহ, বিবাহের বয়স, উত্তরাধিকার সম্পর্কিত ধারাগুলোও সুনির্দিষ্টভাবে আছে। তালাক ছাড়া অন্য কোনোভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত বিধানও এই আইনে বর্ণিত হয়েছে।

আলোচ্য আইন অনুসারে প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকতে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না। তবে প্রথম স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব, অপেক্ষাকৃত স্থায়ী মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা, দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষায় ব্যর্থতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় সালিশি কাউন্সিল দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দিতে পারে। আর অনুমতি ছাড়া কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করলে স্ত্রীর দেনমোহরের টাকা তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করতে হবে। এ বিধানের লঙ্ঘন করলে এক বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা ১০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে। আলোচ্য আইনে মুসলিম ছেলে ও মেয়ের বিয়ের বয়স যথাক্রমে ১৮ ও ১৬ বছর নির্ধারণ করা হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে এ বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছর। আলোচ্য আইনে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। এই আইন প্রণয়নের আগে বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় ছেলে মারা গেলে তার সন্তানেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু এ আইন সে নিয়মের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বর্তমানে কোনো ব্যক্তি জীবিত থাকা অবস্থায় তার সন্তান মারা গেলে এবং ওই মৃত ছেলে বা মেয়ের সন্তান থাকলে তারা প্রতিনিধিত্বের হারে বাবার সম্পত্তির অংশ পাবে।

সংশ্লিষ্ট আইনের ওপরের ধারাগুলো উদ্দীপকের ছকে উঠে আসেনি। এই সবগুলো ধারার সমন্বয়ে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অত্যন্ত কার্যকর একটি আইন হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ▶৪ কাবিল মিয়া দুষ্ট প্রকৃতির লোক। অনাথ জরিনা বেগমকে বিয়ে করে। বিয়ের পর কারণে-অকারণে জরিনাকে মারপিট করে। একদিন সে জরিনাকে এক নারী পাচারকারী দালালের কাছে বিক্রি করে দেয়। জরিনার মামা বিষয়টি জানতে পেরে কাবিলের বিরুদ্ধে মামলা করে। *[বি.বো., দি. বো., চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০; বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. বাংলাদেশে যৌতুক নিরোধ আইন পাস হয় কত সালে? ১

খ. বাল্যবিবাহ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে জরিনার মামা কোন আইনের মাধ্যমে কাবিলের বিচার চাইতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উক্ত আইনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে যৌতুক নিরোধ আইন পাস হয় ১৯৮০ সালে।

খ বাল্যবিবাহ বলতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের বিবাহকে বোঝায়।

বিবাহের প্রথম শর্ত হলো ছেলে-মেয়ের বয়স। প্রচলিত আইন অনুসারে বাংলাদেশে বিবাহের জন্য ছেলের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর আর মেয়ের বয়স ১৮ বছর হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, ছেলে ও মেয়ের প্রকৃত বয়সকে পাশ কাটিয়ে সমাজে অনেক বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ে দুজনেরই অথবা কোনো একজনের বয়স কম হয়ে থাকে। আর এ ধরনের বিবাহই বাল্যবিবাহ।

গ উদ্দীপকের জরিনার মামা ২০০৩ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ আইনের মাধ্যমে কাবিলের বিচার চাইতে পারেন।

আমাদের দেশে সামাজিকভাবে প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের ভয়াবহতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় সংসদ কর্তৃক 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০" প্রণয়ন করে। আইনটি ২০০৩ সালে সংশোধিত হয়। এই আইনের নারী পাচার সম্পর্কিত ধারা অনুসারে উদ্দীপকের কাবিলের বিচার করা সম্ভব।

উদ্দীপকের কাবিল তার স্ত্রীকে কারণে-অকারণে নির্যাতন করে এবং এক পর্যায়ে এসে এক নারী পাচারকারী দালালের কাছে বিক্রি করে দেয়। এমতাবস্থায় জরিনার মামা কাবিলের বিরুদ্ধে মামলা করেন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ এর ৫ নং ধারায় এ ধরনের অপরাধের প্রকৃতি ও শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যদি কোনো নারীকে কোনো পতিতার নিকট বা পতিতালয়ের ব্যবস্থাপকের নিকট বিক্রয় করা হয়, তাহলে যে ব্যক্তি এই কর্ম সাধন করেছেন তিনি সুনির্দিষ্ট দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক বিশ বছর কিন্তু অন্যূন দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন'। কাবিলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

ঘ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সমাজ থেকে নানা ধরনের অপরাধ নিরসনকল্পে আইন প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের সমাজে নারী ও শিশু নির্যাতন অন্যতম সামাজিক অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে সমাজে শান্তি নষ্ট হয়। এ প্রেক্ষিতে সরকার ২০০৩ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনকে আরও কার্যকর করার জন্য ঢেলে সাজিয়েছে।

আমাদের সমাজে নারীরা প্রতিনিয়ত নানাভাবে ঘরে-বাইরে নির্যাতিত হচ্ছে। যৌতুকের কারণে তারা স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের দ্বারা নিগৃহীত হয়, কখনো যৌন নিপীড়নের শিকার হয়, আবার কখনো পড়ে পাচারকারীদের খপ্পরে। এভাবে অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হাত থেকে বাঁচতে এক সময় তারা আত্মহননের পথ বেছে নেয়। অন্যদিকে আমাদের সমাজে শিশুশ্রম, শিশু পাচার প্রভৃতি অপরাধমূলক ঘটনাও প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। এ সকল অপরাধ নিরসনে আলোচ্য আইনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পূর্বেকার বলবৎ আইনগুলোর তুলনায় এ আইন নারী ও শিশু নির্যাতন দমনের ক্ষেত্রে অধিক ফলপ্রসূ। ফলে এ আইনটি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত কার্যকর। তবে এই আইনের প্রয়োগকে আরও সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, আলোচ্য আইনটি যদি যথার্থভাবে প্রয়োগ করা যায় তবে সমাজ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন আরও হ্রাস পাবে।

প্রশ্ন ▶৫ শিশুদের অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সরকার সচেষ্ট। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে একটি আইন প্রণয়ন করে যা শিশুদের লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সাথে ব্যবহার এবং শিশু অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে জড়িত।

[চা. বো. চ. বো., রা. বো. দি. বো., সি. বো. ব. বো. য. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৬]

ক. হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন করা হয় কত সালে? ১

খ. সামাজিক আইনের একটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন আইন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে? এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'এ আইন শিশুদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ দলিল'— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন করা হয় ২০১২ সালে।

খ সামাজিক আইনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমাজের সকল প্রকার কু-প্রথা দূর করা।

আমাদের সমাজে এখনো অনেক কু-প্রথা ও কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। এগুলো সমাজের স্বাভাবিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন বিধবা বিবাহ ও সতীদাহ প্রথা সম্পর্কিত কুসংস্কার নারীদের জন্য অমানবিক ছিল। এরূপ সমস্যা দূর করার জন্যই বিভিন্ন সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয়। এর ফলে সমাজ থেকে এ সকল কুপ্রথা দূর হয়।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে ১৯৭৪ সালের শিশু আইন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এ কারণে শিশুদের সার্বিক কল্যাণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। আর এ জন্যই শিশু আইন প্রণয়ন করা দরকার। বাংলাদেশ সরকার বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করে।

১৯৭৪ সালের শিশু আইনের মাধ্যমে একটি শিশুর লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সাথে ব্যবহার এবং শিশু অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত আইন নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এবং ১৯৮০ সালের ১ জুন বাংলাদেশে আইনটি বলবৎ করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। এর পাশাপাশি শিশু অধিকারও রক্ষিত হচ্ছে। আমাদের দেশে একটি শিশুর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে এ আইনটির বিকল্প নেই। উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনটি বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে প্রণয়ন করে। আইনটি শিশুদের লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সাথে ব্যবহার এবং শিশু অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে জড়িত। এ সকল বৈশিষ্ট্য শিশু আইন-১৯৭৪ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ আমাদের দেশে শিশু আইন-১৯৭৪ শিশুদের কল্যাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়।

শিশুদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা প্রতিটি রাষ্ট্রেরই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শিশুরা যেন যোগ্য মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রকেই সচেষ্ট থাকতে হয়। আর এ জন্য শিশুদের সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট আইন অত্যন্ত কার্যকর। বাংলাদেশের শিশু আইন-১৯৭৪ শিশুদের সার্বিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আমাদের দেশের শিশুরা যেন সকল সমস্যা থেকে মুক্ত থাকে সে উদ্দেশ্যেই শিশু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনে কোনো শিশুকে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবার কিশোর অপরাধীদের জন্য কিশোর আদালত ও হাজত স্থাপনের বিধান রাখা হয়েছে। যা মূলত কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের উদ্দেশ্যেই কাজ করে। এ আইনে শিশু শ্রমকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শিশু শ্রমের জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া শিশু আইনে শিশুর রোগ নিরাময়, শাস্তিদান, জামিন প্রদান, সংশোধন ব্যবস্থা, মুক্তি প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ফলে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ সুনিশ্চিত হচ্ছে। আর এভাবেই শিশু আইন শিশুদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। তবে আইনের যথাযথ বাস্তবায়নে সরকারকে আরও উদ্যোগী হতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, শিশু আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৬

[কু. বো. ১৬। প্রশ্ন নং ৫]

ক. কোন আইনটিকে একাধারে শিশুকল্যাণ, নারী কল্যাণ ও নিরাপত্তামূলক সামাজিক আইন বলে? ১

খ. সামাজিক আইন কীভাবে সামাজিক সমস্যা দূর করে উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. ছকে উল্লিখিত প্রশ্নবোধক চিহ্নিত বক্সে কোন সামাজিক আইনের নাম লিখলে ছকটি সম্পূর্ণ হবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আইনটি যেদিন থেকে প্রণীত হয়েছে শুধু কি সেইদিন থেকে পরবর্তী, নাকি পূর্ববর্তী দম্পতিরা ছকে উল্লিখিত অধিকার ভোগ করতে পারবে? মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ-১৯৬১ কে একাধারে শিশুকল্যাণ, নারীকল্যাণও নিরাপত্তামূলক সামাজিক আইন বলা হয়।

খ সামাজিক আইন বর্তমান সমস্যা প্রতিকার এবং ভবিষ্যত সমস্যা প্রতিরোধে আইনগত ভিত্তি তৈরি করে। এর ফলে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দূর হয়।

সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা, মাদকাসক্তি প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা ও অনাচার দীর্ঘদিন সমাজে বিদ্যমান। এসব সমস্যা প্রতিরোধে সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তা কার্যকর হয়নি। পরবর্তীতে সামাজিক আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সমস্যাগুলোর প্রতিকার করা অনেকাংশে সম্ভব হয়। ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিরোধ আইন, বাল্যবিবাহ আইন-১৯২৯, যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০ প্রভৃতি সামাজিক আইন এ সংশ্লিষ্ট সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

গ ছকে উল্লিখিত প্রশ্নবোধক চিহ্নিত বক্সে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন-২০১২ লিখলে ছকটি সম্পূর্ণ হবে।

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন সম্পর্কিত আইনটি মূলত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রীয় বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রণীত হয়। এই আইনে মোট ১৫টি ধারা এবং কিছু উপধারা আছে। বাংলাদেশে বসবাসরত সকল হিন্দু নাগরিকদের জন্য এ আইন প্রযোজ্য। এ আইনে ১৮ বছরের কম বয়সী হিন্দু নারী এবং ২১ বছরের কম বয়সী হিন্দু পুরুষের বিবাহকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। সেইসাথে হিন্দু ধর্ম, রীতিনীতি এবং আচার অনুযায়ী বিয়ে সম্পন্ন হবার পর দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে নিবন্ধক কর্তৃক বিবাহ নিবন্ধনের বিধান রাখা হয়। এছাড়াও নিবন্ধনের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধনের প্রতিলিপি সরবরাহেরও ব্যবস্থা রাখা হয়।

উদ্দীপকে ছকটির প্রশ্নবোধক স্থানে একটি সামাজিক আইনের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আইনটির কতগুলো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো— নিবন্ধক নিয়োগ, বিবাহ নিবন্ধন ও প্রতিলিপি গ্রহণ, নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি, তত্ত্বাবধায়ক নিয়ন্ত্রণ ও নিবন্ধক ফিস প্রভৃতি। এই বৈশিষ্ট্যগুলো হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন-২০১২ এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, ছকটিতে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইনের ইঙ্গিত আছে।

ঘ উদ্দীপকের আইনটি অর্থাৎ হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন-২০১২, যেদিন থেকে প্রণীত হয়েছে সেই দিন থেকে নয়, বরং পূর্ববর্তী দম্পতিরাও ছকে উল্লিখিত অধিকার ভোগ করতে পারবে।

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন-২০১২ এর বিবাহ নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি অংশে বলা হয়েছে, হিন্দু ধর্ম, রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠান অনুযায়ী বিয়ে সম্পন্ন হবার পর তার দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে যেকোনো পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে বিবাহ নিবন্ধক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিবাহ নিবন্ধন করবেন। তবে এ আইন কার্যকর হবার পূর্বে হিন্দু ধর্ম, রীতি নীতি ও আচার অনুষ্ঠান অনুযায়ী সম্পন্নকৃত বিয়ের যেকোনো পক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদনের প্রেক্ষিতে বিবাহ নিবন্ধন করা যাবে। উদ্দীপকে নির্দেশিত আইনটি কার্যকর হবার পূর্বে যাদের বিয়ে হয়েছে তারা এ আইনের অধীনে নিবন্ধিত না হলেও শাস্ত্র অনুযায়ী বিয়ের বৈধতা ক্ষুণ্ন হবে না। সেইসাথে তারা বিবাহ নিবন্ধন প্রাপ্তি, প্রতিলিপি গ্রহণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ফিস প্রদান, নিবন্ধকের মাধ্যমে প্রতিলিপি গ্রহণ, সংশ্লিষ্ট জেলার রেজিস্ট্রারের তত্ত্বাবধানে নিবন্ধন প্রভৃতির সুযোগ পাবেন। এক্ষেত্রে আইন কার্যকর হবার আগে বিয়ে সম্পন্ন করা কোনো বাধা হিসেবে কাজ করবে না।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হিন্দু বিবাহ আইনের বিধান অনুযায়ী সব ধরনের সুবিধা আইনটি প্রণীত হবার পূর্বে অথবা পরে বিয়ে সম্পন্নকারী যেকোনো দম্পতি ভোগ করতে পারবেন।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৭ চার সন্তানের মা হওয়া সত্ত্বেও রেবেকার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায়। রেবেকা তার স্বামীকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে সে বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নেয়। অবশেষে ১৯৬১ সালে প্রণীত একটি আইনের বলে সে তার অধিকার রক্ষা করতে সক্ষম হয়। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. শিশু আইনটি কত সালে সারা দেশে বলবৎ হয়? ১

খ. 'যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০' প্রণয়নের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন আইনের ইঙ্গিত করা হয়েছে? উক্ত আইনের উল্লেখযোগ্য দুটি ধারা সম্পর্কে লেখো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিশু আইনটি ১৯৮০ সালের ১ জুন সারাদেশে বলবৎ হয়।

খ যৌতুকের মতো অমানবিক প্রথা রোধ করার জন্য 'যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০' প্রণয়ন করা হয়।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে দেনমোহর প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা হলে বাধ্যতামূলক দেনমোহর পুরুষের জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এরই প্রভাব হিসেবে যৌতুকের প্রচলন দেখা দেয়। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে যৌতুকের নেতিবাচক প্রভাব দিন দিন বাড়তে থাকে। তার সাথে বাড়তে থাকে নারী নির্যাতন ও নারী হত্যার মতো অপরাধ। এ সকল সমস্যা মোকাবিলা করতে প্রণয়ন করা হয় যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০।

গ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক কু-প্রথা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এদেশে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বেশ অসামঞ্জস্য ছিল। এ অবস্থা মোকাবিলায় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার নারীর মর্যাদা রক্ষা, অধিকার আদায় ও পরিবারের সুখ-শান্তি ও শিশুদের উত্তরাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালের ৭ আগস্ট একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। যা পরবর্তীতে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন নামে পরিচিতি পায়।

বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের স্বার্থ রক্ষায় এ আইন ছিল এক ধরনের নিরাপত্তা কবচ। কেননা এই আইন মহিলা ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ এনে দিয়েছে। এই আইন প্রণয়নের আগে কোনো স্বামী মুখ দিয়ে তালাক উচ্চারণ করলেই তালাক হয়ে যেত। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী লিখিত প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে দেনমোহর ও ভরণপোষণের খরচ থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু এ আইনে বিবাহ রেজিস্ট্রির বিধান রাখার ফলে নারীর আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের সুযোগ এসেছে। এমনকি স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করা এবং স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স নির্ধারণসহ পিতৃহীন এতিম ছেলেমেয়ের স্বার্থরক্ষার জন্যও এই আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীদের কল্যাণে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন এক নিরাপত্তা সেফগার্ড হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ▶ ৮ যূথি নামের ফুটফুটে একটি মেয়ে বাড়ির সামান্য দূরে অবস্থিত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। স্কুল গেইটের সামনের গ্যারেজে কর্মরত কয়েকটি ছেলে প্রায়শ তাকে উত্যক্ত করত। একদিন এক ছেলে তার ওড়না টেনে ধরে। ঘটনাটি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানালে স্কুল কর্তৃপক্ষ তা আমলে নিয়ে ছেলেটিকে জরিমানা করে গ্যারেজ থেকে তাড়িয়ে দেয়। এর কিছুদিন পর প্রতিশোধ নিতে ছেলেটি যূথির মুখে এসিড ছুঁড়ে মারে এবং এতে সে সামান্য আহত হয়। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. 'যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০' কত সাল থেকে কার্যকর হয়? ১

খ. সামাজিক আইনের তিনটি উদ্দেশ্য আলোচনা করো। ২

গ. যূথির উপর হামলাকারীর বিচার যে যে ধারায় হবে আইনটির নাম উল্লেখপূর্বক ধারাগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত আইনের সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০' ১৯৮১ সালের ১ অক্টোবর থেকে সারাদেশে কার্যকর হয়।

খ সামাজিক আইন সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রণীত এবং সমাজে সৃষ্ট সমস্যা ও অবাঞ্ছিত অবস্থা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে সামাজিক আইন প্রয়োগ করা হয়।

সামাজিক আইনের নানা উদ্দেশ্য বিদ্যমান। প্রথমত সামাজিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ সামাজিক আইনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এ আইনের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে সমষ্টি ও সামাজিক স্বার্থের প্রতি সচেতন থেকে সমাজ অনুমোদিত আচরণ করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়ত, সামাজিক সমস্যা সমাধান এবং ভবিষ্যৎ সমস্যা প্রতিরোধ সামাজিক আইনের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। তৃতীয়ত, সামাজিক সাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সামাজিক আইন প্রণীত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত অপরাধ হচ্ছে এসিড নিক্ষেপ করে মুখের বিকৃতি ঘটানো। এক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন-২০০৩ অনুযায়ী উপযুক্ত শাস্তির বিধান রয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন-২০০৩ অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি দহনকারী বা ক্ষয়কারী পদার্থ দ্বারা নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এই কারণে যদি কোনো শিশু বা নারীর শ্রবণ শক্তি নষ্ট, যৌনাঙ্গ বা স্তন বিকৃতি ঘটে সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এছাড়া শরীরের অন্য কোনো অঙ্গহানি, বিকৃতি বা নষ্ট হলে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

পাড়ার গ্যারেজের কর্মচারী একটি ছেলে যূথিকে এসিড ছুঁড়ে মারে। এতে যূথি আহত হয়। এ অপরাধের শাস্তি হিসেবে ছেলেটি চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত ৫০ হাজার টাকা জরিমানার দণ্ড ভোগ করবে।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ (সংশোধন) আইন-২০০৩-এর কয়েকটি ধারা সংশোধন করলেও কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ (সংশোধন) আইন-২০০৩ সময়ের পরিবর্তন ও বাস্তবতার আলোকে সংশোধন করা হলে নারী নির্যাতন সংশ্লিষ্ট সকল অপরাধ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। নারীর প্রতি গৃহ সহিংসতা, জোরপূর্বক গর্ভপাত, পর্ণোগ্রাফি, নারীর নিরাপদ চলাচলে বাধা প্রদান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি ও শব্দ উচ্চারণ, উত্যক্ত করা ইত্যাদির জন্য অপরাধী হওয়ার ধারা বর্জন করা হয়েছে। এ ধরনের অপরাধের জন্য কোন যুগোপযোগী সংশোধনী আনা হয়নি।

সংশোধিত আইনে সংযোজিত নতুন ধারায় সম্ভ্রমহানি ঘটার পর, কেউ আত্মহত্যার প্ররোচনা হিসেবে গণ্য করা হলেও উত্যক্তকারীর মানসিক নির্যাতনের কারণে আত্মহননে বাধ্য করলেও তা অপরাধ বলে গণ্য হয় না। ধর্ষনের ফলে জন্ম নেয়া সন্তান, ধর্ষক বা ধর্ষিতার পরিচয়ে বড় হবে, সমাজে এর গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনার দাবি রাখে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, উক্ত আইনে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা দূর করতে আইন সংশোধনের সংজ্ঞা আইনের যথার্থ প্রয়োগ প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ৯ কেরামত আলী প্রথম স্ত্রী'র অনুমতি ব্যতীত আরেকটি চৌদ্দ বছরের মেয়েকে বিয়ে করে। বিষয়টি নিয়ে স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে প্রায়ই কথা কাটাকাটি, ঝগড়াবিবাদ ও মারামারি পর্যন্ত হয়। একসময় কেরামত মৌখিকভাবে তিন তালাক দিয়েই স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। এমতাবস্থায় কেরামত আলীর স্ত্রী ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের কতগুলো নির্দিষ্ট ধারায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন জানায়।

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]

https://teachingbd24.com

ক. ১৯৭৪ সালের শিশু আইন কত সালে ঢাকায় প্রয়োগ হয়? ১
খ. যৌতুক নিরোধ আইনের গুরুত্ব বর্ণনা করো। ২
গ. ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের যেসব ধারায় কেরামত আলীর বিচার হবে সেসব ধারা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭৪ সালের শিশু আইন ১৯৭৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় প্রয়োগ করা হয়।

খ নারী নির্যাতন ও হত্যা রোধ এবং নারীর উন্নয়নকল্পে যৌতুক নিরোধ আইন প্রত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যৌতুক একটি বড় ধরনের কু-পথা। নারী অধিকার সংরক্ষণ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে 'যৌতুকনিরোধ আইন-১৯৮০' একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এই আইনের সংশোধনী খসড়ায় বলা হয়েছে, কোনো নারীর স্বামী, স্বামীর পিতা-মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর লক্ষ্যে অন্য কোনো ব্যক্তি যৌতুকের জন্য কোনো নারীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। এর ফলে সমাজে মানুষের মধ্যে এ বোধশক্তি জাগ্রত হবে যে যৌতুক আদান-প্রদান করলে শাস্তি নিশ্চিত এবং সমাজে হেয়প্রতিপন্ন হতে হবে।

গ ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের দ্বিতীয় বিয়ে এবং তালাক সম্পর্কিত ধারায় উদ্দীপকের কেরামত আলীর বিচার হবে।

১৯৬১ সালের ১৫ জুলাই থেকে কার্যকর হওয়া মুসলিম পারিবারিক আইনটি বাংলাদেশের নারীদের স্বার্থরক্ষার এক ধরনের রক্ষাকবচ। এই আইনের একটি ধারা দ্বিতীয় বিয়ে সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রথম স্ত্রী বর্তমান থাকতে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না। তবে স্বামী তার স্ত্রীর সম্মতিক্রমে সালিশ পরিষদের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিবাহ করা যাবে। এই আইনের আরেকটি ধারা তালাক সম্পর্কে বর্ণিত আছে। কয়েকবার তালাক উচ্চারণ করলেও তালাক হয় না। কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে স্বামীকে ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর চেয়ারম্যানের নিকট লিখিত নোটিশ দিতে হবে এবং অনুরূপ কপি স্ত্রীকেও দিতে হবে। নোটিশ দেওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটাতে ব্যর্থ হলে ৯০ দিন পর তালাক কার্যকর হবে। নারীদের অধিকার রক্ষায় এ ধরনের আরো কয়েকটি ধারা উল্লেখ রয়েছে মুসলিম পারিবারিক আইনে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কেরামত আলী প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত দ্বিতীয় বিয়ে সম্পন্ন করে এবং একপর্যায়ে প্রথম স্ত্রীকে মৌখিকভাবে তালাক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইন অনুযায়ী, কেরামত আলী আইন ভঙ্গ করায় উক্ত আইনের দ্বিতীয় বিয়ে এবং তালাক ধারা দুটি অনুযায়ী বিচার কার্য সম্পন্ন হবে। এতে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হবে। আর মৌখিক তালাকের কারণে সর্বাধিক এক বছর কারাভোগ অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক কু-প্রথা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এদেশে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বেশ অসামঞ্জস্য ছিল। এ অবস্থা মোকাবিলায় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার নারীর মর্যাদা রক্ষা, অধিকার আদায় ও পরিবারের সুখ-শান্তি ও শিশুদের উত্তরাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালের ৭ আগস্ট একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। যা পরবর্তীতে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন নামে পরিচিতি পায়।

বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের স্বার্থ রক্ষায় এ আইন ছিল এক ধরনের নিরাপত্তাকবচ। কেননা এই আইন মহিলা ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ এনে দিয়েছে। এই আইন প্রণয়নের আগে কোনো স্বামী মুখ দিয়ে তালাক উচ্চারণ করলেই তালাক হয়ে যেত। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী লিখিত প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে দেনমোহর ও ভরণপোষণের খরচ থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু এ আইনে বিবাহ রেজিস্ট্রির বিধান রাখার ফলে নারীর আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের সুযোগ এসেছে। এমনকি স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে করা এবং স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এটি নারীদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স নির্ধারণসহ পিতৃহীন এতিম ছেলেমেয়ের স্বার্থরক্ষার জন্যও এই আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীদের কল্যাণে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন এক নিরাপত্তা সেফগার্ড হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ▶ ১০ মি. 'ক' প্রথম স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। ফলে 'ক'-এর স্ত্রীর সাথে তার বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে মি. 'ক' তার স্ত্রীকে মৌখিকভাবে তিন তালাক দেন। তার স্ত্রী আদালতে মামলা করেন। এখন মামলাটি বিচারাধীন। *[মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. যৌতুক কী? ১
খ. নারী নির্যাতন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনায় 'ক' এর স্ত্রী কোন আইনের আশ্রয় নিতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের নারীদের দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন রক্ষা করার ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ধারাগুলো কীভাবে ভূমিকা রাখে তা আলোচনা কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে বা বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে উপঢৌকন দেয় তাই যৌতুক।

খ নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করা যা নারীর জন্য মর্যাদা হানিকর তাই নারী নির্যাতন। নারীর শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি নানা অজুহাত দেখিয়ে নারীর ওপর দৈহিক ও মানসিকভাবে নিপীড়ন চালানো বা ক্ষেত্র বিশেষে নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করে কোনো অবৈধ কিছু করাই হলো নারী নির্যাতন।

গ উদ্দীপকের ঘটনায় 'ক'-এর স্ত্রী ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের আশ্রয় নিতে পারে।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের মাধ্যমে মুসলিম নারীদের মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই আইনে বলা হয়েছে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। আর প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে করলে স্ত্রীগণের দেনমোহর তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করতে হবে। আর স্ত্রী অভিযোগ করলেও তা প্রমাণিত হলে স্বামীকে আইন অনুযায়ী শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই আইনে আরও বলা হয়েছে মুখে কয়েকবার তালাক উচ্চারণ করলেই স্ত্রী তালাক হয় না। কোনো স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে স্বামীকে যথাশীঘ্র ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর চেয়ারম্যানের কাছে নোটিশ দিতে হবে এবং অনুরূপ কপি স্ত্রীকেও দিতে হবে। এ ধারা ভঙ্গ করলে স্বামীকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

উদ্দীপকে মি. 'ক' প্রথম স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় বিয়ে করেন। একপর্যায়ে মি. 'ক' তার প্রথম স্ত্রীকে মৌখিকভাবে তালাক দেন। এতে তার স্ত্রী আদালতে মামলা করেন। আর এক্ষেত্রে 'ক'-এর স্ত্রী উপরে বর্ণিত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের আশ্রয় নিতে পারেন।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক কু-প্রথা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এদেশে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বেশ অসামঞ্জস্য ছিল। এ অবস্থা মোকাবিলায় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার নারীর মর্যাদা রক্ষা, অধিকার আদায় ও পরিবারের সুখ-শান্তি ও শিশুদের উত্তরাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালের ৭ আগস্ট একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। যা পরবর্তীতে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন নামে পরিচিতি পায়।

বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের স্বার্থ রক্ষায় এ আইন ছিল এক ধরনের নিরাপত্তাকবচ। কেননা এই আইন মহিলা ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ এনে দিয়েছে। এই আইন প্রণয়নের আগে কোনো স্বামী মুখ দিয়ে তালাক উচ্চারণ করলেই তালাক হয়ে যেত। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী লিখিত প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে দেনমোহর ও ভরণপোষণের খরচ থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু এ আইনে বিবাহ রেজিস্ট্রির বিধান রাখার ফলে নারীর আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের সুযোগ এসেছে। এমনকি স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করা এবং স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এটি নারীদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স নির্ধারণসহ পিতৃহীন এতিম ছেলেমেয়ের স্বার্থরক্ষার জন্যও এই আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

তাই সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীদের কল্যাণে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন এক নিরাপত্তা সেফগার্ড হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ▶ ১১ মাদকদ্রব্যের সর্বগ্রাসী আগ্রাসনে সুখী নীলগঞ্জের সামাজিক পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল হচ্ছে। বিশেষত কিশোর ও যুবকদের মাঝে এর বিস্তার বেশি। আসিফ ও রাকিব নামের দুই মাদক চোরাচালানকারী নাকের ডগায় থেকে এ ব্যবসা চালাচ্ছে। তারা সব সময় ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে কিন্তু গত মাসে স্বয়ং চেয়ারম্যান সাহেব তাদের ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন। *[সরকারি বাঙলা কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. শিশু আইনে কতটি ধারা আছে? ১

খ. সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন একে অন্যের উপর নির্ভরশীল কেন? ২

গ. উদ্দীপকে আসিফ ও রাকিব কোন আইনে সাজা পেতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশের মাদকদ্রব্যের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে উক্ত আইন সহায়ক? ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিশু আইনের ধারা ৭৮টি।

খ সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য সামাজিক আইন প্রণীত হয়, ফলে এ দুটি বিষয় একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যা সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন— যৌতুক একটি সামাজিক সমস্যা। এ ধরনের সমস্যা দূর করার লক্ষ্যেই সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয়। আবার আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হলে সমাজে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। অর্থাৎ সামাজিক সমস্যা ও আইন একে অন্যের পরিপূরক।

গ উদ্দীপকের আসিফ ও রাকিব মাদক চোরাচালানের সাথে জড়িত থাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯০ অনুযায়ী তাদের সাজা হতে পারে।

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ ও যুবসমাজকে মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে এ সম্পর্কিত অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ১৯৯০ সালে অধ্যাদেশটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন হিসেবে গৃহীত হয়। এই আইনে মাদকদ্রব্য চোরাচালানের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

উদ্দীপকের আসিফ ও রাকিব দীর্ঘদিন ধরে নীলগঞ্জ থানায় মাদক চোরাচালানের ব্যবসা করছে। সম্প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে তাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখন প্রচলিত আইন অনুসারেই তাদের বিচার এবং শাস্তি হবে। বাংলাদেশে ১৯৯০ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনে মাদকদ্রব্যের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে শাস্তির উল্লেখ আছে। যেমন— হেরোইনের মতো ভয়াবহ মাদকের ক্ষেত্রে মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ২৫ গ্রাম হলে কমপক্ষে ২ বছর এবং অনূর্ধ্ব ১০ বছর কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। তাই বলা যায়, আসিফ ও রাকিব চোরাচালান করা মাদকদ্রব্যের প্রকৃতি ও পরিমাণের ওপর নির্ভর করে আলোচ্য আইনে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যাবে।

ঘ আমি মনে করি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে তা বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের বিস্তার রোধে সহায়ক হবে।

মাদকাসক্তি আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা। এই সমস্যা সৃষ্টির অন্যতম কারণ হলো মাদকদ্রব্যের অবাধ বিস্তার। তাই এ সমস্যার সমাধানে মাদকের বিস্তার রোধের বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮৯ অনুসারে, ১৯৯০ সালে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে একই বছরের ৯ সেপ্টেম্বর এটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে যায়। এই অধিদপ্তর মাদকদ্রব্যের বিস্তার প্রতিরোধে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। অধিদপ্তরের অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে— মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা, মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা করা এবং মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তোলা। এভাবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। সংশ্লিষ্ট আইনটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো মাদক ব্যবসার সাথে জড়িতদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান। আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি মাদক গ্রহণ, সরবরাহ, বহন, বিপণন, চাষাবাদ ও সংরক্ষণ করলে সর্বনিম্ন দুই বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে মাদকের শ্রেণি, প্রকৃতি, পরিমাণ ও প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় নেওয়া হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, আলোচ্য আইনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে উপযোগী ধারার সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। কাজেই আইনের কঠোর প্রয়োগ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ১২

[সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]

ক. যৌতুক নিরোধ আইনটি কত সালে কার্যকর হয়? ১

খ. আমল-অযোগ্য অপরাধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ছকে প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থানে কোন আইনের নাম লিখলে অ্যারো ছকগুলো হবে তার ধারা? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছকে উল্লেখিত আইনের ধারাগুলো মহিলাদের অধিকার সুরক্ষায় একটি মাইলফলক পাঠ্যবইয়ের আলোকে তোমার মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যৌতুক নিরোধ আইনটি কার্যকর করা হয় ১৯৮১ সালে।

খ যে সকল অপরাধের ক্ষেত্রে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়া আসামিকে গ্রেফতার করতে পারে না, সেগুলোকে আমল-অযোগ্য অপরাধ বলা হয়।

Teachingbd24.com

আমল অযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী কোনো প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কোনো অপরাধীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলেই কেবল কোনো পুলিশ কর্মকর্তা তাকে গ্রেফতার করতে পারবেন।

গ সৃজনশীল ৩ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ ছকে উল্লিখিত আইনের ধারাগুলো নারীর অধিকার সুরক্ষায় একটি মাইল ফলক—কথাটি যথার্থ।

সামাজিক কু-প্রথা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এদেশে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বেশ অসামঞ্জস্য ছিল। এ অবস্থা মোকাবিলায় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার নারীর মর্যাদা রক্ষা, অধিকার আদায় ও পরিবারের সুখ-শান্তি ও শিশুদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালের ৭ আগস্ট একটি অধ্যাদেশ জারি করে। যা পরবর্তীতে ১৯৬১ সালের 'মুসলিম পারিবারিক আইন' নামে পরিচিতি পায়।

বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের স্বার্থ রক্ষায় এ আইন ছিল এক ধরনের নিরাপত্তা কবচ। কেননা এই আইন মহিলা ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ এনে দিয়েছে। এ আইনটি প্রণয়নের আগে কোনো স্বামী মুখ দিয়ে তালাক উচ্চারণ করলেই তালাক হয়ে যেত। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী লিখিত প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে দেনমোহর ও ভরপোষণের খরচ থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু এ আইনে বিবাহ রেজিস্ট্রির বিধান রাখার ফলে নারীর আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের সুযোগ এসেছে। এমনকি স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করা এবং স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এটি নারীদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স নির্ধারণসহ পিতৃহীন এতিম ছেলেমেয়ের স্বার্থরক্ষার জন্যও এই আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, ছকে উল্লিখিত আইনের ধারাগুলো নারীদের অধিকার সুরক্ষার মাইলফলক। কারণ এ আইনগুলো প্রচলন করার ফলে নারী নির্যাতন ও তালাকের প্রবণতা কমেছে। সেই সাথে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ অরুণ একাদশ শ্রেণির ছাত্র। পারিবারিক কারণে ইদানিং সে পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে রাত করেও বাসায় ফিরে। এক পর্যায়ে মাদক গ্রহণ করতে শুরু করে। এ অবস্থা তার জন্য হুমকিস্বরূপ। এ অবস্থা যুবসমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এজন্য সরকার একটি আদেশ জারি করে।

[আজিমপুর গভঃ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৭]

ক. আইন কাকে বলে? ১

খ. আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণের নিয়ন্ত্রক— বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. অরুণের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কোন আইনটি প্রযোজ্য— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত আইন বাস্তবায়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজে বসবাস করার জন্য মানুষকে যেসকল বিধি-বিধান মেনে চলতে হয়, সেগুলোর সমষ্টিকে আইন বলে।

খ আইনের মাধ্যমে মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। কেননা, আইন হলো সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনসাধারণের উপর প্রণীত বিধি-বিধান।

আইন ভঙ্গ করলে মানুষকে শাস্তি পেতে হয়। এজন্য মানুষ আইনের পরিপন্থী কোনো আচরণ বা কাজ করা থেকে বিরত থাকে। এজন্য বলা যায়, আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণের নিয়ন্ত্রক।

গ অরুণের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে 'মাদক নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮৯' আইনটি প্রযোজ্য।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮৯ প্রণীত হয়। এ আইনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের সাথে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজীয় প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ আইনের বিধান অনুযায়ী, বাংলাদেশ সরকার জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এ আইনের আওতায় মাদকাসক্তিজনিত সমস্যা প্রতিরোধের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একাদশ শ্রেণির ছাত্র অরুণ মাদক গ্রহণ শুরু করেছে। উপরে বর্ণিত মাদক নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮৯ আইনটি প্রয়োগ করে অরুণের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করা যায়।

ঘ উক্ত আইন অর্থাৎ 'মাদক নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮৯' বাস্তবায়নে সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৯ সালে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ' জারি করে। এই আইনে মাদক দ্রব্য উৎপাদন, পরিবহন বা সংরক্ষণের জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। সমাজকর্মীরা মাদকাসক্তদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এই আইন প্রয়োগে ভূমিকা রাখতে পারে। তাদেরকে চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও সমাজকর্মীরা সহায়তা করতে পারে। পাশাপাশি মাদকদ্রব্য উৎপাদন, পরিবহন ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে তারা আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তা করতে পারে। আবার, মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচারমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করতে পারে। এতে মাদকাসক্তি অনেকাংশে কমে আসবে।

উদ্দীপকের একাদশ শ্রেণির ছাত্র অরুণ মাদক গ্রহণ শুরু করায় তার জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। মাদকের এই অবস্থা যুব সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। এজন্য সরকার 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮৯' জারি করেছে। আর এ সমাজকর্মীরা উপরোল্লিখিতভাবে এই আইন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ প্রফেসর ওয়াজেদ দৈনিক খবরের কাগজ পড়ছিলেন। একটি সংবাদ তার মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। ইমরান ৯ম শ্রেণির ছাত্র। তার মা বাবা তার জন্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছেন। বাবা-মা তাদের কর্মব্যস্ততার জন্য ইমরানকে সময় দিতে পারেন না। ইমরান তার বন্ধুদের নিয়ে সময় কাটায়। একদিন একটি দামি মোবাইল সেটের জন্য বন্ধুরা তাকে হত্যা করে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তারা সবাই বখাটে ও মাদকাসক্ত ছিল। হত্যাকারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের বয়স কম থাকায় প্রচলিত আইনে তাদের বিচার করা যাচ্ছে না। *[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ৭]*

ক. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ কবে গৃহীত হয়? ১

খ. মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১-এর প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. হত্যাকারী হওয়া সত্ত্বেও ইমরানের বন্ধুদের প্রচলিত আইনে বিচার করা যাচ্ছে না কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. যে আইনে ইমরানের বন্ধুদের বিচার করা যাবে, সে আইনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব আলোচনা কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৯০ সালের ২রা জানুয়ারি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ গৃহীত হয়।

খ মুসলিম বিবাহ ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে গঠিত কমিশনের কিছু সুপারিশের প্রতি কার্যকারিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ- ১৯৬১ প্রণীত হয়।

নারীর মর্যাদা সংরক্ষণ, অধিকার আদায়, পারিবারিক সুখ-শান্তি রক্ষা এবং এতিম শিশুদের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা ছিল এই অধ্যাদেশের অন্যতম উদ্দেশ্য। কেননা অতীতে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ,

https://teachingbd24.com

উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বেশ অসামঞ্জস্য ছিল। এ সকল অসামঞ্জস্য দূর করাই ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশের অন্যতম উদ্দেশ্য।

গ হত্যাকারী হওয়া সত্ত্বেও বয়স কম হওয়ায় প্রচলিত আইনে ইমরানের বন্ধুদের বিচার করা যাচ্ছে না।

১৯৭৪ সালের শিশু আইন অনুযায়ী, ১৬ বছরের কম বয়স্ক ছেলে-মেয়ে শিশু বলে অভিহিত হবে। এ বয়স সীমার ছেলে-মেয়ে যদি একক বা দলবদ্ধভাবে কোনো অপরাধ করে তবে তাদেরকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিচার করা যাবে না। তাদেরকে শিশু আইনের আওতায় এনে বিচার করতে হবে।

কিশোর অপরাধীরা সাধারণত ঝোঁকের বশে অপরাধ করে থাকে। তাই বিচারের সময় তাদেরকে বয়স্ক অপরাধীদের থেকে দূর রেখে শাস্তি না দিয়ে তাদের চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে তারা নিজেদেরকে পরিবর্তন করার সুযোগ পেয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। তা না হলে তারা পরবর্তীতে আরো ভয়ঙ্কর অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। এ কারণে ইমরানের বন্ধুদের প্রচলিত আইনে বিচার না করে শিশু আইনের অধীনে বিচার করতে হবে। যেন তারা তাদের চরিত্র সংশোধনের সুযোগ পায়।

ঘ বাংলাদেশ শিশু আইন-১৯৭৪ এর আওতায় ইমরানের বন্ধুদের বিচার করা যাবে। কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনে শিশু আইনের আইনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশের শিশুদের হেফাজত, সংরক্ষণ, তাদের সঙ্গে আচরণ এবং কিশোর অপরাধীদের বিচার, শাস্তি ও অপরাধপ্রবণতা সংশোধনে বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণীত হয়। বাংলাদেশের শিশু নির্যাতন এবং কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আইনটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।

আলোচ্য শিশু আইন কিশোর অপরাধীদের অপরাধ প্রবণতা সংশোধনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এ আইনের আওতায় গাজীপুরের টঙ্গী ও কোনাবাড়িতে আলাদাভাবে কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া যশোরেও কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলো কিশোর আদালত, কিশোর হাজত এবং সংশোধন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে যে হারে কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে অনুপাতে ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের বাস্তবায়ন হচ্ছে না। উপজেলা পর্যায়ে শিশু আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগের প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া কিশোর অপরাধ সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তবে বাস্তবায়নের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে আইনটি কিশোর অপরাধ সংশোধনে প্রত্যাশানুযায়ী ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছে না। উল্লেখ্য শিশু আইন-১৯৭৪ এর দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে আইনটি রহিত করে শিশু আইন-২০১৩ শিরোনামে নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে ১৯৭৪ সালের আইনটির গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

প্রশ্ন ▶ ১৫ বিয়ের এক বছর পেরিয়ে গেলেও রুনার বাবার কাছ থেকে যৌতুকের পুরো টাকা আদায় হয়নি রুস্তমের। এখন প্রায়ই প্রতিদিনই রুনাকে রুস্তমের কাছ থেকে যৌতুকের কারণে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। *[সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. Law শব্দটি কোন ভাষার শব্দ থেকে এসেছে? ১

খ. সামাজিক আইন কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রুনা কোন আইনের মাধ্যমে সহায়তা পেতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রুস্তমের মতো ব্যক্তিদের সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা রোধের উদ্দেশে এ আইন সাহায্য করে-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Law শব্দটি টিউটোনিক শব্দ Lag থেকে এসেছে।

খ সমাজ থেকে অবাঞ্ছিত অবস্থা দূর করে সুন্দর, সুষ্ঠু ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলার জন্য যে সকল আইন প্রণয়ন করা হয়, সেগুলোই সামাজিক আইন।

নাগরিকের কল্যাণে রাষ্ট্র কর্তৃক নানা ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়। এসব আইন নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যে পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ আইনগুলোর মাঝে জনকল্যাণ সম্পর্কিত আইন হচ্ছে সামাজিক আইন। মূলত সমাজের স্বাভাবিক গতিধারাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয়, তাই সামাজিক আইন।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মি. রায়হান তার আদরের মেয়েকে মনিরের ছেলের কাছে বিয়ে দেন। বিয়ের পূর্বে একটি মোটর সাইকেল ও ১ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু মোটর সাইকেল দিতে পারলেও ১ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ২০ হাজার টাকা দিতে পারেন। বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই বাকি টাকা এনে দেওয়ার জন্য মনির পুত্রবধুর উপর চাপ প্রয়োগ করে। *[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. ১৯৭৪ সালের শিশু আইনে শিশুর বয়স কত? ১

খ. সামাজিক আইনের একটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সমস্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশে প্রচলিত আইনটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭৪ সালের শিশু আইনে শিশুর বয়স ১৬ বছর।

খ সামাজিক আইনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সমাজের সকল প্রকার কু-প্রথা দূর করা।

আমাদের সমাজে এখনো অনেক কু-প্রথা ও কুসংস্কার প্রচলিত রয়েছে। এগুলো সমাজের স্বাভাবিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন— বিধবা বিবাহ ও সতীদাহ প্রথা সম্পর্কিত কুসংস্কার নারীদের জন্য অমানবিক ছিল। এরূপ সমস্যা দূর করার জন্যই বিভিন্ন সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয়। এর ফলে সমাজ থেকে এ সকল কু-প্রথা দূর হয়।

গ উদ্দীপকে যৌতুক সমস্যার প্রতিফলন ঘটেছে।

পাত্র-পাত্রী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে বা বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে উপঢৌকন দিয়ে থাকে তাকে যৌতুক বলে। আর এই প্রথা সামাজিক রেওয়াজে পরিণত হলে তাকে যৌতুক প্রথা বলে। এখানে উপঢৌকন বলতে ঘরবাড়ি, জায়গা-জমি, নগদ অর্থ বা যেকোনো প্রকার আর্থিক সুবিধা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. রায়হান তার আদরের মেয়েকে মনিরের ছেলের সাথে বিয়ে দেন। বিয়ের সময় মি. রায়হান ছেলেকে একটি মোটর সাইকেল ও ১ লক্ষ টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। অর্থাৎ মি. রায়হান তার মেয়ের বিয়ের সময় যৌতুক দেন। কারণ বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ বা কন্যাপক্ষ একে অন্যকে যে নগদ অর্থ বা অন্যান্য দ্রব্যাদি দেয় তাকে যৌতুক বলে।

ঘ উদ্দীপকের সমস্যা অর্থাৎ যৌতুক প্রথা মোকাবিলায় বাংলাদেশে প্রচলিত যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০ যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশে যৌতুক প্রথার ভয়াবহতা থেকে নারীদের রক্ষা করার জন্য যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের বিধান অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে অথবা প্রদান বা গ্রহণে সহায়তা করলে পাঁচ বছর মেয়াদী কারাদণ্ড, যা এক বছরের কম হবে না বা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে। আর যদি কোনো

https://teachingbd24.com

ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনে বা বরের পিতা অথবা অভিভাবকের কাছ থেকে যৌতুক দাবি করে তাহলে সে পাঁচ বছর মেয়াদ পর্যন্ত এবং এক বছর মেয়াদের কম নয় অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে। এ আইন বলবৎ হবার ফলে যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের যেকোনো চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০ নারী সমাজের নিরাপত্তা ও কল্যাণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া আইনটি পারিবারিক সংহতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক হচ্ছে। যদিও সামাজিক সচেতনতা ও আইন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাবে বাস্তবে এ আইনের কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয় না। তথাপি যৌতুক নিরোধের প্রথম আইনগত পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশে আলোচ্য আইনটি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আইনগত ভিত্তি থাকায় সমাজে যৌতুক প্রথা সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া কারিনা স্কুলের সবচেয়ে মেধাবী ও সুন্দরী ছাত্রী। সে নিয়মিত স্কুলে যেত। বর্তমানে সে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। পাড়ার বখাটে ছেলে ডন তাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। কারিনা তা প্রত্যাখ্যান করায় ডন তাকে এসিড ছুঁড়ে মারে। এতে কারিনার মুখের এক পাশ ঝলছে গেছে। *[শাহ মখদুম কলেজ, রাজশাহী | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. মুসলিম পরিবারিক আইন ১৯৬১ অনুযায়ী বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলেদের ন্যূনতম বয়স কত? ১

খ. যৌতুক বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অপরাধের বিচারব্যবস্থা নিরূপণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সংঘটিত অপরাধ মোকাবিলায় আরও কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ অনুযায়ী বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলেদের ন্যূনতম বয়স ২১ বছর।

খ পাত্র-পাত্রী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সময় কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে বা বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে উপঢৌকন দিয়ে থাকে তাকে যৌতুক বলে। এখানে উপঢৌকন বলতে বাড়িঘর, জায়গা-জমি, নগদ অর্থ বা যেকোনো প্রকার আর্থিক সুবিধা ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত অপরাধ হচ্ছে এসিড নিক্ষেপ করে মুখের বিকৃতি ঘটানো। এক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন-২০০৩ অনুযায়ী উপযুক্ত শাস্তির বিধান রয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন-২০০৩ অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি দহনকারী বা ক্ষয়কারী পদার্থ দ্বারা নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এই কারণে যদি কোনো শিশু বা নারীর শ্রবণ শক্তি নষ্ট, যৌনাঙ্গ বা স্তন বিকৃতি ঘটে সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এছাড়া শরীরের অন্য কোনো অঙ্গহানি, বিকৃতি বা নষ্ট হলে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

কারিনা পাড়ার বখাটে ছেলে ডনের প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ডন তাকে এসিড ছুঁড়ে মারে। এতে কারিনার মুখের একপাশ ঝলসে যায়। এ অপরাধের শাস্তি হিসেবে ডন চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত ৫০ হাজার টাকা জরিমানার দণ্ড ভোগ করবে।

ঘ উদ্দীপকে সংঘটিত অপরাধ তথা এসিড নিক্ষেপ মোকাবিলায় আরো বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

এসিড নিক্ষেপের মতো অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান থাকলেও আমাদের দেশের অনেকেই এ সম্পর্কে সচেতন নয়। এক্ষেত্রে দেশের জনগণকে উক্ত আইন সম্পর্কে জানাতে হবে। এ জন্য পত্র-পত্রিকা, রেডিও টেলিভিশনে বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। অপরাধের দায়ে অভিযুক্তদের শাস্তির জন্য সামাজিক আন্দোলন করতে হবে। অপরাধীরা যাতে কোনোক্রমে ছাড় না পায় সে বিষয়ে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। এক্ষেত্রে আইন বিভাগকে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অপরাধের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। তাই এ বিষয়ে আমাদের আরো সচেতন হতে হবে।

এসিডে ক্ষতিগ্রস্ত নারী এবং তার পরিবারের পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে। তাদেরকে মানসিক সমর্থন দানের পাশাপাশি আর্থিকভাবে সহায়তা করতে হবে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের সমাজে স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবনযাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত নারী যাতে আইনগত সহায়তা পায় সে জন্য তাকে সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, এসিড নিক্ষেপ মোকাবিলায় সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। আইনের যথার্থ বাস্তবায়ন এবং মানুষের সমন্বিত প্রচেষ্টাই পারে এসিড নিক্ষেপ অপরাধ মোকাবিলা করতে।

প্রশ্ন ▶ ১৮ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ সরকারও শিশুর অধিকার রক্ষায় নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। শিশুদের অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে একটি আইন প্রণয়ন করে, যা শিশুদের লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের ব্যবহার এবং শিশু অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে জড়িত। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেন কে? ১

খ. বাল্যবিবাহ বলতে কী বুঝ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন আইন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে? এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "এ আইন শিশুদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ দলিল"– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

খ বাল্যবিবাহ বলতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ের বিবাহকে বোঝায়।

বিবাহের প্রথম শর্ত হলো ছেলে-মেয়ের বয়স। প্রচলিত আইন অনুসারে, বাংলাদেশে বিবাহের জন্য ছেলের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর আর মেয়ের বয়স ১৮ বছর হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, ছেলে ও মেয়ের প্রকৃত বয়সকে পাশ কাটিয়ে সমাজে অনেক বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ে দুজনেরই অথবা কোনো একজনের বয়স কম হয়ে থাকে। আর এ ধরনের বিবাহই বাল্যবিবাহ।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৯ আবিদা প্রেম করে ফজলুকে বিবাহ করে। কিন্তু বিয়ের পর ফজলুর মানসিকতা বদলে যায়। সে আবিদাকে প্রতিনিয়ত যৌতুকের জন্য চাপ দিতে থাকে। মাঝে মাঝে আবিদাকে সে শারীরিকভাবে ও নির্যাতন করে। এক পর্যায়ে আবিদা স্বামীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বাবার বাড়ি চলে যায়। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন পাস হয় কবে? ১

খ. সামাজিক আইনের দুটি উদ্দেশ্য সংক্ষেপে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে আবিদা ও তার পরিবার কোন সামাজিক আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত অপরাধসমূহের উক্ত আইনের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আইন পাস হয়।

https://teachingbd24.com

খ সামাজিক আইনের পরিধি ব্যাপক। সমাজে বসবাসরত মানুষের কল্যাণ সাধনই সামাজিক আইনের মূল উদ্দেশ্য।

সামাজিক সমস্যা সমাজের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। এটি এমন একটি অবাঞ্ছিত বা অস্বাভাবিক অবস্থা যা সমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি ও কল্যাণবিরোধী এবং সমাজ কাঠামোতে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। যার প্রতিকার করাই এর লক্ষ্য। সমাজের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করা কু-প্রথাগুলো হলো যৌতুক প্রথা, বাল্যবিবাহ, কুসংস্কার ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকের আবিদা ও তার পরিবার যৌতুকের মতো অমানবিক প্রথা রোধ করার জন্য ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

যৌতুকের মতো অসহনীয় এবং অমানবিক সামাজিক কুপ্রথা নিরোধের উদ্দেশ্যে যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০ প্রণয়ন করা হয়। ১৯৮১ সালে এ আইন কার্যকর হবার পর কোনো ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে বা গ্রহণে সহায়তা করলে সর্বোচ্চ পাঁচ বছর মেয়াদি কারাদণ্ডে দণ্ডিত যা এক বছরের কম হবে না বা জরিমানা বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে। এ ছাড়া কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনে বা বরের অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবি করলে তারও পাঁচ বছর মেয়াদি কারাদণ্ড যা এক বছরের কম হবে না বা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আবিদা প্রেম করে ফজলুকে বিবাহ করে। কিন্তু বিয়ের পর ফজলুর মানসিকতা বদলে যায়। সে আবিদাকে শারীরিক নির্যাতন করে। এক পর্যায়ে আবিদা স্বামীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বাবার বাড়ি চলে যায়। উদ্দীপকের ঘটনা সামাজিক সমস্যা যৌতুককে নির্দেশ করে। আর এ যৌতুককে রোধ করার জন্য ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ প্রণয়ন করা হয়। সুতরাং বলা যায়, আবিদা তার পরিবার ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের আশ্রয় নিতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত অপরাধ হলো ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের আওতাভুক্ত। যা একটি শাস্তি যোগ্য অপরাধ।

যৌতুকের মতো অমানবিক প্রথা রোধ করতে 'যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০' প্রণীত হয়। এ আইন অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনের অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবি করলে পাঁচ বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ড যা এক বছরের কম হবে না অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। এছাড়া যৌতুক প্রদান বা গ্রহণে সহায়তাকারীর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। যৌতুক প্রদানে বাধ্য করা, যৌতুকের জন্য শারীরিক বা মানসিক বা উভয় ধরনের নির্যাতনে উৎসাহিত করা হলে কমপক্ষে পাঁচ বছর কারাদণ্ড বা আর্থিক জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এর ফলে সামাজিকভাবে যে কেউ যৌতুক গ্রহণ বা প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্ক হবে। যৌতুকবিরোধী সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার ব্যাপারে আইনটি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বিয়ের পর ফজলুর মানসিকতা বদলে যায়। সে আবিদাকে নির্যাতন করে। একপর্যায়ে আবিদা বাবার বাড়ি চলে যায়। উদ্দীপকের এ ঘটনা সামাজিক সমস্যা যৌতুককে নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, যৌতুকের কারণে সংঘটিত অপরাধটি ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের আলোকে শাস্তি যোগ্য হবে। ফলে কোনো ব্যক্তি যৌতুকের জন্য নারী-নির্যাতনের মতো জঘন্য অপরাধ করতে সাহস পাবে না।

প্রশ্ন ▶ ২০ হৃদয় হাসান বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় একটি চাকরি করেন। সেখানে কিছু নারীকে বিদেশে পাচারকালে পাচারকারীরা ধরা পড়ে। ঐ সকল নারীদের সাথে কথা বলে হৃদয় হাসান জানতে পারেন, জোরপূর্বক তাদের অপহরণ করে বিদেশে পাচার করা হচ্ছিল।

[অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা ▮ প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন সর্বশেষ কত সালে প্রণীত হয়? ১

খ. সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটিতে বাংলাদেশের প্রচলিত যে আইনের ধারা লঙ্ঘিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নারীদের নিরাপত্তা রক্ষায় উক্ত আইনের বিভিন্ন ধারার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সর্বশেষ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন প্রণীত হয়।

খ সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য সামাজিক আইন প্রণীত হয়, ফলে এ দুটি বিষয় একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যা সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন- যৌতুক একটি সামাজিক সমস্যা। এ ধরনের সমস্যা দূর করার লক্ষ্যেই সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয়। আবার আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হলে সমাজে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। অর্থাৎ সামাজিক সমস্যা ও আইন একে অন্যের পরিপূরক।

গ উদ্দীপকের ঘটনায় বাংলাদেশের প্রচলিত ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন আইনের ধারা লঙ্ঘিত হয়েছে।

নারী নির্যাতন বাংলাদেশের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। সমাজে নারীদের এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রণীত হয় নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ-১৯৮৩। এই আইন অনুযায়ী, যে কেউ যেকোনো বয়সের নারীকে যদি পতিতাবৃত্তি বা কোনো ব্যক্তির সাথে নিষিদ্ধ যৌন সঙ্গমের উদ্দেশ্যে বা কোনো বেআইনি ও অনৈতিক উদ্দেশ্যে আমদানি, রপ্তানি বা বিক্রি করে, ভাড়া দেয় বা অন্যভাবে হস্তান্তর করে বা ক্রয় করে বা অন্যদের কোনোভাবে দখলে নেয়, তবে ওই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড, যা সাত বছরের কম হবে না বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

উদ্দীপকে হৃদয় হাসান সীমান্ত এলাকার একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে। সেখানে নারীদের পাচারকালে পাচারকারীরা ধরা পড়ে। কথা বলে জানা যায়, জোরপূর্বক তাদের বিদেশে পাচার করা হচ্ছিলো। নারী পাচারের এই ঘটনা দ্বারা বাংলাদেশের প্রচলিত ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) আইনের ধারা লঙ্ঘিত হয়েছে।

ঘ নারীদের নিরাপত্তা রক্ষায় নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ-১৯৮৩ এর বিভিন্ন ধারার কার্যকারিতা রয়েছে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সমাজের সকল স্তরে নারীদের প্রতি সহিংসতা এবং নির্যাতন সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা দেখা দেয়। সমাজে নারী নির্যাতন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা এমন আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পায় যে, প্রচলিত আইনে এসবের বিচার করা সম্ভব হচ্ছিল না। এমতাবস্থায় নারী নির্যাতন নিরোধকল্পে তদানীন্তন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক 'নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অর্ডিন্যান্স-১৯৮৩' জারি করেন।

বাংলাদেশের সকল নাগরিক এবং স্বল্প সময়ের জন্য বাংলাদেশে বসবাসরত অন্য যেকোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত আইনটি প্রযোজ্য। বাংলাদেশের নারী নির্যাতন নিরোধকল্পে প্রণীত প্রথম আইনগত ব্যবস্থা হিসেবে ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন অধ্যাদেশের গুরুত্ব অপরিসীম। নারী সমাজের নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিধানে নিশ্চয়তাদানের ক্ষেত্রে এটি একটি বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। এটি বাস্তবায়নে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে নারী সমাজের কল্যাণ সাধন সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালে উক্ত আইনটি রহিত করা হলেও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ প্রণয়নের মাধ্যমে আইনটির অনেক ধারা বলবৎ করা হয়েছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২১ নাজমা বেগম তার দুই সন্তানকে ফিরে পেতে আদালতের শরণাপন্ন হন। তার সন্তানেরা তাদের বাবার কাছে থাকেন। দাম্পত্য কলহ ও পারিবারিক অশান্তির কারণে তারা উভয়ই এক বছর যাবৎ আলাদা বসবাস করেন। তার স্বামী তার ভরণপোষণ দেন না। এমনকি বাচ্চাদের সাথে দেখাও করতে দেন না।

[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৮]

ক. সরকারি সমাজসেবা বলতে কী বোঝ? ১

খ. সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে নাজমা বেগম কোন আইনে মামলা করতে পারবেন? আইনটির স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'বাংলাদেশে মুসলমান নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও নিরাপত্তা প্রদানে উক্ত আইনটি সফল ভূমিকা পালন করছে'—মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারি সমাজসেবা বলতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গৃহীত, বাস্তবায়িত ও নিয়ন্ত্রিত সমাজসেবা কার্যক্রমকে বোঝায়।

খ সব সমস্যা সামাজিক সমস্যা নয়। সামাজিক সমস্যার নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে উদ্ভূত এবং সমাধানযোগ্য। এটি একটি প্রত্যাশিত বিষয়, অনুভবযোগ্য ও বিমূর্ত ধারণা। চাপসৃষ্টিকারী ও মূল্যবোধ পরিপন্থী। এটি পরিবর্তনযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য। সামাজিক সমস্যা সর্বজনীন। স্থান, কাল, পাত্র ও সমাজভেদে সামাজিক সমস্যা ভিন্ন দেখা যায়। যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাধান করা যায়।

গ উদ্দীপকের নাজমা বেগম ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে মামলা করতে পারবেন।

মুসলিম সমাজে নারীদের সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হলেও সামাজিক কু-প্রথা এবং নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন। তাই নারীদের মর্যাদা রক্ষা, অধিকার আদায় ও শিশুদের উত্তরাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে ১৫ জুলাই থেকে এ আইন কার্যকর হয়।

মুসলিম পারিবারিক আইনে মহিলা ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো— বিবাহ রেজিস্ট্রি করা, দ্বিতীয় বিয়ের বাধা-নিষেধ, দেনমোহর পরিশোধ, তালাকের নিয়ম, বিবাহের বয়স, ভরণপোষণ, বিবাহ ব্যতীত অন্য কোনোভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ, সন্তানদের উত্তরাধিকার ইত্যাদি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর নিকট অনুমতি নিতে হবে, তা না হলে দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে না, স্ত্রীর প্রয়োজনমত ভরণপোষণ দিতে হবে না হলে স্ত্রী এ আইনে মামলা করতে পারবেন। এছাড়া সন্তানদের উত্তরাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে এ আইনের গুরুত্ব অনেক। এ আইন প্রণয়নের আগে মৃত ছেলের সন্তানরা বাবার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতো এবং সন্তানদের সঠিক পরিমাণ সম্পত্তি দেওয়া হতো না। এ আইন প্রণয়নের ফলে ছেলে-মেয়ে উভয়ের সম্পত্তির অংশ পাচ্ছে। এভাবে মুসলিম পারিবারিক আইন-১৯৬১ মুসলিম শিশু ও নারীর কল্যাণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, নাজমা বেগম ও তার স্বামীর দাম্পত্য কলহ ও পারিবারিক অশান্তির কারণে তারা আলাদা থাকে। সেই সাথে তার স্বামী তাকে ভরণপোষণও দেয় না। নাজমা বেগম এসব অধিকার ফিরে পেতে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে মামলা করতে পারবেন। এ আইনের মাধ্যমে উপরোল্লিখিত সামাজিক সমস্যা দূর করতে এবং তার ন্যায্য অধিকার আদায় করতে পারবেন। সুতরাং বলা যায়, নাজমা বেগম ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে মামলা করতে পারেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক কু-প্রথা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এদেশে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয় বেশ অসামঞ্জস্য ছিল। এ অবস্থা মোকাবিলায় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার নারীর মর্যাদা রক্ষা, অধিকার আদায় এবং পরিবারের সুখ-শান্তি ও শিশুদের উত্তরাধিকার প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালের ৭ আগস্ট একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। যা পরবর্তীতে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন নামে পরিচিতি পায়।

বাংলাদেশের মুসলিম নারীদের স্বার্থ রক্ষায় এ আইন নিরাপত্তা কবচ। কেননা এই আইন মহিলা ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ এনে দিয়েছে। এই আইন প্রণয়নের আগে কোনো স্বামী মুখ দিয়ে তালাক উচ্চারণ করলেই তালাক হয়ে যেত। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী লিখিত প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে দেনমোহর ও ভরপোষণের খরচ থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু এ আইনে বিবাহ রেজিস্ট্রির বিধান রাখার ফলে নারীর আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের সুযোগ এসেছে। এমনকি স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করা এবং স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এটি নারীদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স নির্ধারণসহ পিতৃহীন এতিম ছেলেমেয়ের স্বার্থরক্ষার জন্যও এই আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় নারীদের কল্যাণে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন এক নিরাপত্তা সেফগার্ড হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ▶ ২২ দরবেশপুর গ্রামটি সর্বনাশা ইয়াবার আখড়া। কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ সকলেই ইয়াবার নেশায় আসক্ত। সম্প্রতি মাদকবিরোধী অভিযানে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে মাদকের কেনা, বেচা ও পরিবহন। সাময়িক স্বস্তিতে থাকে গ্রামবাসী।

[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ, কুমিল্লা | প্রশ্ন নং ৪]

ক. গণমাধ্যম কী? ১

খ. পরিবার কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকের দরবেশপুর গ্রামটিতে অভিযানে ধৃতদের কোন আইনে সাজা হবে? আইনটির ধারাগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন ও সমাজকর্মী পরিপূরক ভূমিকা পালন করতে পারে? বিশ্লেষণ পূর্বক মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গণমাধ্যম হচ্ছে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার মাধ্যম।

খ পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংগঠন। এ সংগঠনকে কেন্দ্র করে মানবসমাজ গড়ে উঠেছে।

পরিবার হলো এমন একটি সংগঠন যেখানে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য পরিজন একত্রে বসবাস করে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করার মাধ্যমে পরিবার গঠন করে।

গ উদ্দীপকের দরবেশপুর গ্রামটিতে অভিযানে ধৃতদের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বা নিরোধ আইন ১৯৮৯ অনুসারে সাজা হবে। মাদকাসক্তি প্রতিরোধে ১৯৮৯ সালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ প্রণীত হয়। এই আইনের কিছু উল্লেখযোগ্য ধারা ও কার্যক্রম রয়েছে। যা মাদকের ভয়াবহতা থেকে দেশ ও সমাজকে রক্ষা করতে ভূমিকা রাখছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের আওতায় একটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এ বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মাঝে আছে মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর বিষয় প্রতিরোধে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা, মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা প্রভৃতি। এ আইনের ধারায় মাঠ পর্যায়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনানুযায়ী প্রদত্ত লাইসেন্স ছাড়া কোনো রকম মাদক উৎপাদন ও সরবরাহ নিষিদ্ধ করা হয়। সেই সাথে অনুমতি ব্যতীত অ্যালকোহল জাতীয় পণ্য উৎপাদন, সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাত, আমদানি ও রপ্তানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এই আইনের আওতায় সরকার

https://teachingbd24.com

মাদকাসক্তদের জন্য এক বা একাধিক মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগও উন্মুক্ত রাখে। তাই বলা যায়, মাদকাসক্তি প্রতিরোধে ১৯৮৯ সালে প্রণীত আইনটির ধারা ও কার্যক্রমগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন ও সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে মাদকাসক্তি অন্যতম। মাদকের মরণ ছোবলে দেশের তরুণ ও যুবশক্তি ধ্বংসের দারপ্রান্তে উপনীত। এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষাকল্পে প্রণীত হয়েছে ১৯৮১ সালের মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ। আর এদেশের মাদকদ্রব্য ও মাদকাসক্তদের নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন ও সমাজকর্মী বিশেষ ভূমিকা রাখে। এছাড়া একজন সমাজকর্মী সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদকের কুফল সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে অবহিত করতে পারেন। জনগণের কল্যাণে প্রশাসন মাদকের দোকান বন্ধ করতে পারেন। এছাড়াও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সর্বোতভাবে দেহ তল্লাশি করতে পারেন। মাদক নিরোধ আইনের বিধান অনুযায়ী মাদক বিস্তার রোধে যেসব নীতিমালা রয়েছে তার বাস্তবায়ন ও কার্যকর শাস্তির ব্যবস্থা করলে এ সমস্যা নির্মূল হবে।।

সমাজকর্মী মূলত একজন পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। এ ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল (ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্ম) প্রয়োগ করে মাদকাসক্তির মতো ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

সমাজকর্মীরা মাদকের ভয়াবহ সমস্যা মোকাবিলায় গবেষক, প্রশাসক ও সামাজিক চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া তারা মাদকাসক্ত ব্যক্তির দৈহিক, সামাজিক, পারিবারিক, চিকিৎসা ও আইন-কানুন এবং তার প্রয়োগ সম্পর্কে গবেষণা চালান। কেননা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার ফলে মাদকাসক্তির সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হয়। সেই সাথে মাদকাসক্ত ব্যক্তির প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি প্রশাসন ও গণমাধ্যমের সহায়তায় মাদকের কুফল সম্পর্কে প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারে। এভাবে সরকার ও সমাজকর্মীর পরিপূরক ভূমিকাই পারে মাদক দ্রব্য বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করতে। তাই বলা যায়, সমাজকর্মী ও প্রশাসনের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করলে রাষ্ট্র, সমাজ তথা দেশের প্রত্যেকটি স্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করবে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ শিশুদের হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সাথে ব্যবহার, চিকিৎসা ও কিশোর অপরাধীদের বিচার এবং শাস্তি সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনের বিধান মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিশোর আদালত, আটক নিবাস এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন কত সালে প্রণীত হয়? ১

খ. শিল্প সমাজকর্ম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত সামাজিক আইনের দুইটি ধারা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কিশোর অপরাধ দূরীকরণে উক্ত আইনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১২ সালে হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন প্রণীত হয়।

খ শিল্প সমাজকর্ম (Industrial Social Work) বলতে কারখানার পরিবেশে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সাহায্য করার লক্ষ্যে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতার অনুশীলনকে বোঝায়।

শিল্প সমাজকর্ম পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনের একটি বিশেষায়িত শাখা। এক্ষেত্রে শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা প্রয়োগ করা হয়। মূলত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সামাজিক ভূমিকা ও মানবিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্য করাই শিল্প সমাজকর্মের লক্ষ্য।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সামাজিক আইনটি হলো ১৯৭৪ সালের হিন্দু আইন।

শিশুদের অধিকার রক্ষা ও কল্যাণ সাধনে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন অনুযায়ী দেশে কিশোর আদালত, আটক নিবাস, প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের একটি ধারা হলো শিশুর বয়স ও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত ধারা। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের এ ধারায় শিশুদের বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬ বছর। সেই সাথে কোনো শিশুকে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে কেউ যদি কোনো শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে উৎসাহী করে তাহলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। ঐ ব্যক্তি এক বছর কারাদন্ড ভোগ করবেন অথবা তিনশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। শিশু আইনের আরেকটি ধারা হলো শিশুর রোগ নিরাময় সংক্রান্ত এ আইনের মাধ্যমে মারাত্মকভাবে রোগাক্রান্ত কোনো শিশুর চিকিৎসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। এ বিধান অনুযায়ী কোনো শিশু যদি অধিক সময় রোগাক্রান্ত থাকে থাহলে তার চিকিৎসার জন্য আদালত ঐ আইন বলে কোনো হাসপাতাল অথবা চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠাতে পারবেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে শিশু ও কিশোর অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন মোতাবেক কিশোর আদালত আটক নিবাস এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এতে বোঝা যায়, উক্ত আইনটি হলো ১৯৭৪ সালের শিশু আইন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষার্থী কিশোর অপরাধী হিসেবে বিবেচিত। কিশোর অপরাধীদের রক্ষায় 'শিশু আইন-১৯৭৪' অত্যন্ত কার্যকর বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে শিশুদের হেফাজত, সংরক্ষণ, তাদের সঙ্গে ব্যবহার এবং কিশোর অপরাধীদের বিচার, শাস্তি ও অপরাধ প্রবণতা সংশোধনের জন্য 'শিশু আইন-১৯৭৪' প্রণীত হয়। বাংলাদেশের কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে শিশু আইনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিশু আইন-১৯৭৪ এর বিধান অনুযায়ী ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে জাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিশোর আদালত, কিশোর হাজত এবং সংশোধন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে এটি গঠিত। অনুরূপ দ্বিতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যশোরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ি নামক স্থানে জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানও এ আইনের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া অপরাধী কিশোরদের বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর ফলে তারা পরবর্তীতে সমাজে পুনর্বাসিত হওয়ার সুযোগ পায়। এছাড়া বয়স্ক অপরাধীদের থেকে দূরে রাখার কারণে তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

শিশু আইন-১৯৭৪ কিশোর অপরাধ সংশোধনে অত্যন্ত কার্যকর হলেও বাস্তবায়নের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে এটি প্রত্যাশানুযায়ী ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ বাংলাদেশে পথশিশুদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি দেশের ভবিষ্যত কর্ণধার যদি হয় আজকের একটি শিশু, তাহলে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কতটুকু শাণিত তা সহজেই বোঝা যায়। প্রতিনিয়ত অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা প্রতারিত ও শোষিত হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ দ্বারা। একটি ছোট্ট শিশু তার অসহায়ত্ব ও অবুঝ মনকে পুঁজি করে নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলে প্রতিনিয়ত মত্য থাকে এক শ্রেণির লোক। দেখা যায়, দিনে শুধুমাত্র দুবেলা খাবারের বিনিময়ে

Teachingbd24.com

শিশুদের দ্বারা কাজ করা হচ্ছে অনেক। কাজের একটু-আধটু এদিক সেদিক হলেই শুরু হয় শারীরিক নির্যাতন। নির্যাতনের শিকার হয়ে অনেক শিশুর মৃত্যু ঘটেছে—এরকম নজির বাংলাদেশে অহরহ।

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৮]

ক. বাংলাদেশে কত বছর বয়স পর্যন্ত ব্যক্তিকে শিশু বলা যায়? ১

খ. সামাজিক আইন কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন আইনটি রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বঞ্চিত ও পথ শিশুদের জন্য যে সামাজিক আইনটির ইঙ্গিত রয়েছে সে সামাজিক আইনটির বিশেষ ৪টি ধারা বর্ণনা করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ব্যক্তিকে শিশু বলা যায়।

খ সমাজ থেকে অবাঞ্ছিত অবস্থা দূর করে সুন্দর, সুষ্ঠু ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলার জন্য যে সকল আইন প্রণয়ন করা হয় সেগুলোই সামাজিক আইন।

নাগরিকের সামগ্রিক কল্যাণে রাষ্ট্র কর্তৃক নানা ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়। এ সকল আইন নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যে পরিবর্তন আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ আইনগুলোর মাঝে জনকল্যাণ সম্পর্কিত আইন হচ্ছে সামাজিক আইন। মূলত সমাজের স্বাভাবিক গতিধারাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হয় তাই সামাজিক আইন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার জন্য শিশু আইন ১৯৭৪ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এ কারণে শিশুদের সার্বিক কল্যাণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। আর এজন্যই শিশু আইন প্রণয়ন করা দরকার। বাংলাদেশ সরকার বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই ১৯৭৪ সালে শিশু আইন ১৯৭৪ প্রণয়ন করে। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের মাধ্যমে একটি শিশুর লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাঁদের সাথে ব্যবহার এবং শিশু অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত আইন নির্ধারণ করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এবং ১৯৮০ সালের ১ জুন বাংলাদেশে আইনটি বলবৎ করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। এর পাশাপাশি শিশু অধিকারও রক্ষিত হচ্ছে। আমাদের দেশে একটি শিশুর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে এ আইনটির বিকল্প নেই। উদ্দীপকে উল্লিখিত আইনটি বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালে প্রণয়ন করে। আইনটি শিশুদের লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সাথে ব্যবহার এবং শিশু অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়ের সাথে জড়িত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশে পথ শিশুদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা প্রতারিত ও শোষিত হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ দ্বারা। শুধু দুবেলা খাবারের বিনিময়ে শিশুদের দিয়ে অনেক কাজ করায়। এভাবে শিশুরা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, অনেক শিশুর মৃত্যুও ঘটছে। শিশুদের এসব নির্যাতন রোধে প্রণীত হয় শিশু আইন ১৯৭৪। সুতরাং বলা যায়, শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে বঞ্চিত ও পথ শিশুদের জন্য কল্যাণমূলক সামাজিক আইন 'শিশু আইন ১৯৭৪'-কে নির্দেশ করা হয়েছে, যে আইনটির ৭৮টি ধারা রয়েছে।

উপমহাদেশে যতগুলো শিশু কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার মধ্যে ১৯৭৪ সালের শিশু আইন উল্লেখযোগ্য। এ আইনের মাধ্যমে একটি শিশুর লালন-পালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সাথে ব্যবহার আইন নির্ধারিত হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলোর কার্যকরী বাস্তবায়ন শিশুর কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, অসহায় ও পথশিশুদের ব্যবহার করে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করছে। শুধুমাত্র খাবারের বিনিময়ে শিশুদের দ্বারা অনেক কাজ করাচ্ছে। শিশুদের এ সকল নির্যাতন প্রতিরোধ শিশু আইন-১৯৭৪ প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের ৪টি উল্লেখযোগ্য ধারা হলো- শিশুর বয়স ও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগে বিধি-নিষেধ করা। কেউ যদি কোনো শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে উৎসাহিত করে তাহলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এছাড়া কিশোর হাজত স্থাপন, শিশুর রোগ নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও শিশু শ্রমিক শোষণ নিষিদ্ধ করা। এভাবে শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তায় শিশু আইন ১৯৭৪ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায় বঞ্চিত ও পথ শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে শিশু আইন ১৯৭৪ ও এর ধারাগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ জব্বার মিয়ার একজন স্ত্রী রাহেলা বেগম থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রথম স্ত্রী রাহেলা বেগমের অনুমতি না নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে হিসেবে সাখিনা আক্তারকে বিয়ে করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ প্রথম স্ত্রী রাহেলা বেগমের সাথে জব্বারের বিভিন্ন বিষয়ে বনিবনা হচ্ছিল না। ঠিকমতো খাবার, ভরণপোষণও রাহেলা বেগমের কপালে জুটতো না। দ্বিতীয় বিয়েটি করার পর রাহেলা বেগম কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে আইনের শরণাপন্ন হন। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. Social Legislation-এর বাংলা প্রতিশব্দ কী? ১

খ. সামাজিক আইনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলো লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাহেলা বেগম কোন সামাজিক আইনটির শরণাপন্ন হয়েছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রাহেলা বেগম যে সামাজিক আইনটির শরণাপন্ন হয়েছেন তার বিশেষ বিশেষ ধারাগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক Social Legislation-এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো— সামাজিক আইন।

খ সামাজিক আইনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো সমাজের সার্বিক নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা ও সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন কু-প্রথা দূর করা।

সামাজিক আইনের প্রধান লক্ষ্যই হলো সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা। এছাড়া সমাজে প্রচলিত কু-প্রথা দূর করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাহেলা বেগম ১৯৬১ সালে প্রণীত মুসলিম পারিবারিক আইনের শরণাপন্ন হয়েছেন। কারণ এ আইনের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সামাজিক কু-প্রথা ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এদেশে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বেশ অসামঞ্জস্য ছিল। এ অবস্থা মোকাবিলায় তৎকালীন সরকার নারীর মর্যাদা রক্ষা, অধিকার আদায় ও পরিবারের সুখ-শান্তি ও শিশুদের উত্তরাধিকার আদায়ে একটি আইন করে। এ আইন অর্থাৎ ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন নারী নিরাপত্তা সেফগার্ড হিসেবে পরিচিত। এ আইনে বলা হয় প্রতিটি বিবাহের রেজিস্ট্রি করতে হবে এবং দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকতে তার অমতে করতে পারবে না। এ আইন অনুযায়ী কয়েকবার তালাক উচ্চারণ করলেই তালাক হবে না এবং তার জন্য তাকে ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর চেয়ারম্যানের নিকটও স্ত্রী নোটিশ দিতে হবে। এছাড়া ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে অসমর্থ হলে স্ত্রী যেকোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

উদ্দীপকের জব্বারের একজন স্ত্রী রাহেলা বেগম থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া জব্বার দ্বিতীয় বিয়ে করে ও রাহেলাকে ভরণপোষণ দেয় না। উপায় না পেয়ে রাহেলা স্বামীর বিরুদ্ধে আইনের শরণাপন্ন হন। উদ্দীপকের রাহেলা ১৯৬১ মুসলিম পারিবারিক আইনের ধারাগুলো

https://teachingbd24.com

বিবেচনা করে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। সুতরাং বলা যায়, রাহেলা বেগম মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১-এর শরণাপন্ন হয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকের রাহেলা বেগম ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের শরণাপন্ন হয়েছেন। এ আইনের উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু ধারা রয়েছে।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ধারাগুলো হলো— বিবাহ রেজিস্ট্রি করা, দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি, দেনমোহর পরিশোধ, তালাকের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ, বিবাহের বয়স নির্ধারণ, ভরণপোষণ, তালাক ব্যতীত অন্য কোনোভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ তিনটি ধারা হলো— দ্বিতীয় বিয়ের ক্ষেত্রে অনুমতি; প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকলে তার অমতে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। তবে চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে স্বামী-স্ত্রীর মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে সালিশি পরিষদের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে। এছাড়া তালাকের ক্ষেত্রে কয়েকবার উচ্চারণ করলেই তালাক হবে না। তার জন্য লিখিত নোটিশ, দিতে হবে। সেই সাথে কোনো স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দিতে অসমর্থ হলে বা একাধিক স্ত্রীর বেলায় সমভাবে প্রতিপালন করতে না পারলে স্ত্রী বা স্ত্রীগণ আইনানুগ প্রতিকার চেয়ে চেয়ারম্যানের বরাবর দরখাস্ত করতে পারবেন। উল্লিখিত ধারাগুলো মুসলিম নারীর নিরাপত্তার সেফগার্ড হিসেবে পরিচিত। উদ্দীপকে দেখা যায়, জব্বার তার প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে করে এবং প্রথম স্ত্রীকে ঠিকমতো ভরণপোষণ দেয় না। যা ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের লঙ্ঘন। এ আইনের ধারাগুলোতে স্পষ্টভাবে বিয়ের ক্ষেত্রেও ভরণপোষণের বিধি-নিষেধ উল্লেখ করা আছে।

পরিশেষে বলা যায়, রাহেলা বেগম ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের শরণাপন্ন হয়েছেন। এ আইনের বিশেষ বিশেষ ধারাগুলো তার অধিকার রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ শিল্পী ক্লাস সেভেনে পড়ে। সে মেধাবীও বটে। একদিন স্কুলে যাবার পথে পাড়ার বখাটে ছেলে রবি তাকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। শিল্পী রেগে উঠে তাকে বকা দেয় এবং এ ধরনের কথা আবার বললে তার বাবার কাছে নালিশ দেবে বলে সতর্ক করে দেয়। পরদিন স্কুলে যাবার পথে রবি শিল্পীর মুখে এসিড ছুঁড়ে দেয়। শিল্পী এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। *[বালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ১০]*

ক. মুসলিম পারিবারিক আইন কত সালে প্রণয়ন করা হয়? ১

খ. নারী নির্যাতন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত অপরাধের বিচার সংশ্লিষ্ট আইন কোনটি? উক্ত আইনে এসিড সন্ত্রাসের ধারাগুলো উল্লেখ করো। ৩

ঘ. শিল্পীর মতো মেয়েদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে উক্ত আইনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন প্রণয়ন করা হয়।

খ নারী নির্যাতন বলতে নারীদের প্রতি নৃশংস আচরণকে বোঝায়।

এ নির্যাতন নারীর শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার হতে পারে। সমাজকাঠামোর পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। আর উদ্ভব হয় নতুন নতুন সমস্যা, যার অন্যতম হলো নারী নির্যাতন। নারী নির্যাতনের বিভিন্ন ধরন রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যৌতুক, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষন, নারী পাচার, জোরপূর্বক বিয়ে ইত্যাদি। এ সমস্যা রোধকল্পে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হলেও সমাজে এখনো নারী নির্যাতন হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত অপরাধের বিচার সংশ্লিষ্ট আইনটি হলো নারী ও শিশু নির্যাতন (সংশোধন) আইন-২০০৩।

নারী ও শিশু নির্যাতন সমাজে অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই এ ধরনের নির্যাতনমূলক অপরাধ দমনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ প্রণীত হয়। যা পরবর্তীতে সংশোধন করে ১৩ জুলাই ২০০৩ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধনী) আইন-২০০৩ পাস করা হয়। নারী ও শিশু নির্যাতনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিকে এ আইনের আওতায় শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে রবি শিল্পী প্রস্তাব দিলে শিল্পী রেগে উঠে তাকে বকা দেয় ও পরবর্তীতে আর এ ধরনের কথা বললে তার বাবার কাছে নালিশ দেবে বলে সতর্ক করে দেয়। পরদিন স্কুলে যাওয়ার পথে রবি শিল্পীর মুখে এসিড ছুঁড়ে দেয়। উদ্দীপকের এ ঘটনা ২০০৩ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ আইনে এসিড নিক্ষেপের শাস্তি স্বরূপ রবির মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এমনকি অর্থদণ্ডও হতে পারে। এ পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর দৃষ্টিশক্তি কিংবা শ্রবণ শক্তি নষ্ট; মুখমণ্ডল নষ্ট, যৌনাঙ্গ বা স্তনের বিকৃতি ঘটে বা নষ্ট হয় তাহলে এ ধরনের অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। সর্বোচ্চ চৌদ্দ বচর থেকে সর্বনিম্ন সাত বছর কারাদণ্ড ভোগ করার পাশাপাশি তাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডও প্রদান করতে হবে।

ঘ শিল্পীর মতো মেয়েদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০৩ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নারীদের নির্যাতন রোধে ও তাদের নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন দমন আইন-২০০৩ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১২টি উপ-অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনা হয়েছে এবং অপরাধের বিচার ও তদন্ত সম্পর্কিত ছয়টি ধারা সংযোজন করা হয়েছে। এ আইনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন করার জন্য বেশকিছু ব্যবস্থা ও শাস্তির বিধান রয়েছে। আর এগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্পীর মতো মেয়েদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা করবে।

উদ্দীপকে রবি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে শিল্পীর মুখে এসিড ছুঁড়ে মারে। যার ফলে শিল্পী এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। এ আইনের বিধান অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিভক্ত দাহ্য পদার্থ দ্বারা কোনো নারী বা শিশুকে মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এমনকি অর্থদণ্ডও হতে পারে। এ পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর দৃষ্টিশক্তি কিংবা শ্রবনশক্তি নষ্ট, মুখমন্ডল নষ্ট, যৌনাঙ্গ বা স্তনের বিকৃতি ঘটে বা নষ্ট হয় তাহলে এ ধরনের অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। সর্বোচ্চ চৌদ্দ বছর থেকে সর্বনিম্ন সাত বছর কারাদন্ড ভোগ করার পাশাপাশি তাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডও প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি এ আইন নারী ও শিশু কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এ আইনে নারী ও শিশুর সার্বিক দিক বিবেচনা করে অপরাধীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, আইনটি যথাযথ বাস্তবায়িত হলে দেশ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন কমে যাবে। নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং শিল্পীর মতো মেয়েরা সঠিক বিচার পাবে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ সখিনার সাথে পাশের গ্রামের করিমের বিবাহ হয় ৬ মাস আগে। বিয়ের পর থেকেই তার শ্বশুর বাড়ি থেকে যৌতুকের জন্য চাপ দেওয়া হয়। কিন্তু সখিনার বাবা গরিব মানুষ বিধায় তিনি যৌতুকের দাবি মেটাতে পারেননি। ফলে সখিনার স্বামী ও শাশুড়ি মিলে সখিনাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে। *[বালকাঠি সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ২]*

ক. হিন্দু বিবাহ রেজিস্টি আইন কত সালে করা হয়? ১

খ. ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের ২টি ধারা উল্লেখ করো। ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত হত্যাকারীদের বাংলাদেশে কোন আইনের আওতায় বিচার করা যায়? যুক্তি দেখাও। ৩

ঘ. উক্ত আইনটি সমস্যা সমাধানে কতখানি অবদান রাখতে পারবে বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দেখাও। ৪

https://teachingbd24.com

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১২ সালে হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রি আইন করা হয়।

খ শিশুদের সার্বিক কল্যাণে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণীত হয়। এর ৭৮টি ধারা রয়েছে। প্রধান দুটি ধারা হলো—

শিশুর বয়স ও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগে বিধি-নিষেধ। এ ধারাটিতে শিশুদের বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬ বছর পর্যন্ত। এবয়সের কোনো শিশুকে কেউ যদি ভিক্ষাবৃত্তিতে উৎসাহিত করে তাহলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। অপরটি হলো কিশোর আদালত স্থাপন। এ আদালতের লক্ষ্য অপরাধী কিশোরদের আচরণ ও চরিত্র সংশোধন করা।

গ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ গণি মিয়ার একজন স্ত্রী জরিনা বেগম থাকা সত্ত্বেও তিনি জরিনা বেগমের অনুমতি না নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে হিসেবে রূপন্তী আক্তারকে বিয়ে করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ জরিনা বেগমের সাথে গণি মিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে বনিবনা হচ্ছিল না। ঠিকমতো খাবার, ভরণপোষণও জরিনা বেগমের কপালে জুটতো না। দ্বিতীয় বিয়েটি করার পর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে আইনের শরণাপন্ন হন।

[শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সরকারি কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৬]

ক. হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন কখন প্রণীত হয়? ১

খ. সামাজিক আইন ও সামাজিক সমস্যা পরস্পর সম্পর্কিত— বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত জরিনা বেগম কোন সামাজিক আইনটির শরণাপন্ন হয়েছেন? ৩

ঘ. উদ্দীপকের জরিনা বেগম যে সামাজিক আইনটির শরণাপন্ন হয়েছেন তার বিশেষ বিশেষ ধারাগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন প্রণীত হয় ২০১২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর।

খ সামাজিক আইন ও সামাজিক সমস্যা পরস্পর সম্পর্কিত। এ কারণে যেকোনো সামাজিক সমস্যাই হলো সামাজিক আইনের ভিত্তি।

সামাজিক আইন হলো এমন সব নিয়ম-কানুনের সমষ্টি, যা সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। এ আইনগুলো সামাজিক সমস্যা সমাধান ও সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির স্বার্থসংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সামাজিক সমস্যা দূর করা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকে কেন্দ্র করে সামাজিক আইন প্রণীত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জরিনা বেগম যে সামাজিক আইনটির শরণাপন্ন হয়েছেন সেটি হলো ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন মহিলা ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক সুযোগ এনে দিয়েছে। কেননা এ আইন প্রণয়নের পূর্বে স্বামী মুখ দিয়ে তালাক দিলেই নারীরা তালাক হয়ে যেত এবং তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী লিখিত প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে দেনমোহর ও খোরপোষ থেকে বঞ্চিত হতো। তাছাড়া ইচ্ছা করলেই স্ত্রীর অমতে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে ও স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ এসেছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত জরিনা বেগম ভরণপোষণের জন্যে এবং তার অমতে দ্বিতীয় বিবাহ করার কারণে কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের শরণাপন্ন হন।

ঘ উদদীপকে উল্লিখিত জরিনা বেগম ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের শরণাপন্ন হন এবং এর প্রধান ধারাগুলো তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমত: এই আইন অনুযায়ী, প্রতিটি বিবাহ রেজিস্ট্রি করতে হবে। রেজিস্ট্রি করবেন 'নিকাহ রেজিস্টার।'

দ্বিতীয়ত: এ আইন অনুযায়ী প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকতে তার অমতে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না। তবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে স্বামী ও স্ত্রীর মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে গঠিত সালিশ পরিষদের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে।

তৃতীয়ত: আইনগতভাবে স্ত্রী দেনমোহরের টাকা চাওয়া মাত্র স্বামীর কাছ থেকে তা আদায়যোগ্য বা পরিশোধযোগ্য।

চতুর্থত: কোনো স্বামী তার স্ত্রীর প্রয়োজন মতো ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হলে বা একাধিক স্ত্রীর বেলায় সমভাবে প্রতিপালন না করতে পারলে স্ত্রী বা স্ত্রীগণ যেকোনো আইনানুগ প্রতিকার চেয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর দরখাস্ত করতে পারবেন।

পঞ্চমত: স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যর্থতা স্বামীর ইচ্ছাকৃত না হলেও তা ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উক্ত আইনের ধারাগুলো নারী ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সুযোগ এনে দিয়েছে। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজব্যবস্থায় ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন নারীর কল্যাণার্থে এক নিরাপত্তার সেফগার্ড হিসেবে পরিচিত।

প্রশ্ন ▶ ২৯

[হাজীগঞ্জ মডেল সরকারি কলেজ, চাঁদপুর ▮ প্রশ্ন নং ৭]

ক. HIV-এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. বাল্যবিবাহ বলতে কী বোঝ? ২

গ. প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থান কোন আইনকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামাজিক শৃঙ্খলা আনয়নে উক্ত আইনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক HIV-এর পূর্ণরূপ হলো— Human Immunodeficiency Virus.

খ বাল্যবিবাহ বলতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিবাহকে বোঝানো হয়। এক্ষেত্রে বয়স হলো বিয়ের মাপকাঠি।

বাংলাদেশ শিশু আইন-২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচে সকলেই শিশু হিসেবে গণ্য হবে। তাই আইনগত দিক থেকে ১৮ বছরের নিচের কোনো মেয়ে বা ছেলের বিবাহ সম্পন্ন হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলা হয়। এছাড়া আমাদের দেশে ছেলেদের বিয়ের বয়স ২১ এবং মেয়েদের ১৮ নির্ধারণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী পাত্র বা পাত্রীর বয়স এর কম হলে তা বাল্যবিবাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে ২০১৭ সালের বাল্যবিবাহ আইন অনুযায়ী বিশেষ প্রয়োজনে এবং অভিভাবকের সম্মতিতে পাত্র-পাত্রীর বয়স যথাক্রমে ২১ ও ১৮ বছরের কম হলেও বিবাহ হতে পারবে।

গ ছকে প্রশ্নবোধক চিহ্নিত স্থান 'মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১' কে নির্দেশ করে।

কয়েক দশক আগে স্থানীয় মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বেশ আইনি অসামঞ্জস্য ছিল। এজন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার (বর্তমান বাংলাদেশ) নারীর মর্যাদা রক্ষা, অধিকার আদায়, পরিবারের সুখ-শান্তি এবং সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে 'মুসলিম পারিবারিক আইন' কার্যকর করে।

ছকে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইন অনুসারে প্রতিটি বিবাহ রেজিস্ট্রি হতে হবে। বিবাহ রেজিস্ট্রির জন্য ইউনিয়ন কাউন্সিল এক বা একাধিক ব্যক্তিকে লাইসেন্স দেবে। এই ধারাটি মুসলিম বিবাহের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে।ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সালিশি পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদ স্ত্রীর খোরপোশ ও দেনমোহর আদায়ে সালিশি কার্যক্রম চালায়। স্ত্রীর প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী ভরণপোষণ

https://teachingbd24.com

স্বামী দিতে না পারলে সালিশি পরিষদ স্ত্রীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভরণপোষণের অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়। আলোচ্য আইনে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত ধারাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারা অনুসারে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য স্বামীকে ইউনিয়ন বা পৌর চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত নোটিশ দিতে হবে। এরপর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ৯০ দিন পর তালাক কার্যকর হবে। পরিশেষে বলা যায়, ছকে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের এ ধারাগুলোই দেখানো হয়েছে।

ঘ নারী ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা তথা সামাজিক শৃঙ্খলা আনয়নে উক্ত আইন অর্থাৎ ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলমান সমাজে নারীদের যেমন সম্মান দেখানো হয়েছে, তেমনি তারা প্রচলিত অনেক কু-প্রথা ও সংস্কারের কারণে নির্যাতনেরও শিকার হয়। এক সময় খোরপোষ, উত্তরাধিকার, ভরণপোষণ প্রভৃতি বিষয়ে নারীদের অধিকার ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বেশ অসামঞ্জস্য ছিল। বাবা বা স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার কিংবা ভরণপোষণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের বঞ্চিত করা হতো। কিন্তু ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে এসব সমস্যা সমাধানের একটি সুনির্দিষ্ট পথ তৈরি হয়েছে।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন প্রণয়নের আগে কোনো স্বামী মুখ দিয়ে তালাক শব্দটি উচ্চারণ করলেই তালাক হয়ে যেত এবং তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী লিখিত প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে দেনমোহর ও খোরপোষ থেকে বঞ্চিত হতো। কিন্তু এ আইন অনুযায়ী বিবাহ রেজিস্ট্রি করার ফলে নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। তাছাড়া ইচ্ছা করলেই স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে এবং স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে যা নারীদের স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স নির্ধারণসহ পিতৃহীন এতিম ছেলে-মেয়ের স্বার্থরক্ষার জন্যও এই আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের নারী ও শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ রাহেলা পত্রিকা পড়ছিল। সেখানে একটি সংবাদ দেখে সে বিস্মিত হয়। সে সংবাদ পড়ে জানতে পারে যে, একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপিকাকে তার বেকার স্বামী টাকার জন্য নির্যাতন করে। নির্যাতনে উক্ত অধ্যাপিকার এক চোখ নষ্ট হয়ে যায়।

[সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ১০]

ক. হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন কত সালে প্রণীত হয়? ১

খ. সামাজিক আইন কীভাবে সামাজিক সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধ করে? ২

গ. উদ্দীপকে রাহেলার পড়া সংবাদের ঘটনাটিতে বাংলাদেশের কোন আইনের ধারা লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নারীদের অধিকার রক্ষায় উক্ত আইনের ধারাগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন প্রণীত হয়।

খ সামাজিক আইন অপরাধমূলক সামাজিক সমস্যা নিরসনে শাস্তিমূলক বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে ভূমিকা রাখে।

আমাদের সমাজে নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। যেমন— বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন, কিশোর অপরাধ ইত্যাদি। এ সকল সমস্যা সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। এ প্রেক্ষিতে সামাজিক আইন প্রণীত হয় এবং এর মাধ্যমে উক্ত সমস্যাগুলোর প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক আইনে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকে রাহেলার পড়া সংবাদের ঘটনাটিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩-এর ধারা লঙ্ঘিত হয়েছে।

সমাজ পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ২০০০ সালে পাস করা নারী ও শিশু নির্যাতন রোধ আইনটি ২০০৩ সালে ১৩ জুলাই সংশোধনী এনে জাতীয় সংসদে বিল পাস করা হয়। এই আইনের শিরোনাম হলো নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩। এই আইনে নারীর ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। এই আইনে বলা হয়েছে নির্যাতনের ফলে কোনো নারীর দৃষ্টি শক্তি বা শ্রবণশক্তি, মুখমণ্ডল নষ্ট হলে এ অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

উদ্দীপকে রাহেলা পত্রিকা পড়ে জানতে পারে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকাকে তার বেকার স্বামী টাকার জন্য নির্যাতন করে এক চোখ নষ্ট করে দেয়। রাহেলার পড়া এ সংবাদটি উপরে বর্ণিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

ঘ নারী অধিকার রক্ষায় উক্ত আইন অর্থাৎ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩-এর ধারাগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত নারীরা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। যৌতুকের কারণে তারা স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের দ্বারা নিগৃহীত হয়। কখনো যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, অপহরণের শিকার হয়। আবার কখনো পাচারকারীর কবলে পড়ে। এ ধরনের নির্যাতন থেকে নারীদের রক্ষা ও সমাজে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এক আইনের বিভিন্ন ধারায় যৌতুক আদান প্রদানের জন্য উপযুক্ত শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। যৌন নিপীড়নের জন্য ৩ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। নির্যাতনের ফলে কোনো নারীর মৃত্যু ঘটলে বা ঘটানোর চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা অতিরিক্ত অর্থদণ্ডের উল্লেখ রয়েছে। আবার নির্যাতনের কারণে কোনো নারীর অঙ্গহানি ঘটলে, মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে আটক করা হলে, অপহরণ করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য এ আইনে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এ আইনের কার্যকর প্রয়োগের ফলে সমাজের নির্যাতিত নারীরা সুবিচার পাচ্ছে। নারী নির্যাতন, যৌতুক, যৌন নিপীড়ন, নারী অপহরণ, নারী পাচার প্রভৃতি সমস্যা হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে এই আইনের মাধ্যমে সমাজে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

উদ্দীপকে রাহেলার সংবাদপত্রে পড়া খবরটি ছিল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩-এর লঙ্ঘন। আর উক্ত আইনটি উপরে বর্ণিত নারীর প্রতি সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের সুস্পষ্ট শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে সমাজে নারীদের অধিকার রক্ষায় কাজ করছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সমাজে নারী অধিকার রক্ষায় উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত নারী ও শিশু দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩-এর ধারাগুলো অত্যন্ত কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ ৩১ রতন কুমার ও শীলা দাসের বিয়ে ধর্মীয় পুরহিতের মাধ্যমে ৩ বছর আগে সম্পন্ন হয়। এখন শীলা জানতে পারে রতন কুমারের একজন স্ত্রী ও দুইটি সন্তান রয়েছে। রতন এখন তার পূর্বের স্ত্রীর কাছে ফিরে গেছে ও শীলার ভরণপোষণ দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। শীলা আইনগত সহায়তার জন্য আদালতে গেলে উকিল সাহেব জানান তাদের বিয়ের নিবন্ধন ও কোনো দলিলিক প্রমাণ না থাকায় তাকে আইনগত সাহায্য করা সম্ভব নয়। *[ন্যাশনাল আইডিয়াল কলেজ, খিলগাঁও, ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৯]*

ক. যৌতুক নিরোধ আইন সারা বাংলাদেশে কবে থেকে কার্যকর হচ্ছে? ১

খ. শিশু আইন ১৯৭৪-এর গুরুত্বপূর্ণ ২টি ধারা লিখ। ২

গ. রতন ও শীলার বিয়ের দালিলিক প্রমাণ রাখা কীভাবে সম্ভব ছিল? বিস্তারিত আলোচনা কর। ৩

ঘ. শীলা দাসের মত অসহায় নারীদের জন্য বাংলাদেশ সরকার যে আইন করেছে— তার গুরুত্ব লিখ। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮১ সালের ১ অক্টোবর থেকে সারা বাংলাদেশে কার্যকর হচ্ছে।

https://teachingbd24.com

খ শিশু আইন ১৯৭৪ শিশুকল্যাণমূলক গুরুত্বপূর্ণ একটি আইন, যার ৭৮টি ধারা বিদ্যমান।

শিশু আইন ১৯৭৪-এর বিভিন্ন ধারার মধ্যে শিশুর বয়স ও ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগে বিধি-নিষেধ ও শাস্তিদান ধারা দুটি উল্লেখযোগ্য। এ আইনে শিশুদের বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬ বছর এবং কোনো শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে উৎসাহিত করা হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ আইনে বলা হয়, ১৬ বছর বয়সী কোনো কিশোর কিশোরীকে আটকে রেখে অঙ্গহানি অথবা দৃষ্টি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট করা হয়, তবে অপরাধীর দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

গ উদ্দীপকের রতন ও শীলার হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রি আইন-২০১২ এর গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন এর মাধ্যমে দালিলিক প্রমাণ রাখা সম্ভব ছিল।

হিন্দুধর্মে সাধারণত শুধু শাস্ত্র অনুসরণ করে বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ায় কোনো আইনগত ভিত্তি থাকে না। তাই দালিলিক প্রমাণ রক্ষার জন্য হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন সম্পর্কিত বিধানাবলি প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা থেকে হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রি আইন-২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, অন্য কোনো আইন, প্রথা ও রীতি-নীতিতে যা কিছুই থাকুক না কেন হিন্দু বিবাহের দালিলিক প্রমাণ রক্ষার জন্য হিন্দু বিবাহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন করা যাবে। তবে কোনো হিন্দু বিবাহ এই আইনের অধীনে না হলেও এ জন্য কোনো হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী সম্পন্ন বিবাহের বৈধতা ক্ষুণ্ন হবে না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রতন কুমার ও শীলা দাস কেবল হিন্দু শাস্ত্রমতে বিয়ে সম্পন্ন করে। কিন্তু, রতন কুমারের আরেকজন স্ত্রী ও সন্তান থাকায় সে পূর্বের স্ত্রীর কাছে চলে যায়। এমতাবস্থায়, শীলা আইনের সহযোগিতা কামনা করলে তা পায় না। কারণ তার দালিলিক প্রমাণ নেই। কোনো ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করতে গেলে বিয়ের দলিল হিসেবে বিবাহ নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রি থাকা আবশ্যক। এছাড়া আইনি লড়াই চালানো সম্ভব হবে না। এজন্য রতন ও শীলার বিয়ের দালিলিক প্রমাণ নিবন্ধনের মাধ্যমে রাখা উচিত ছিল।

ঘ শীলা দাসের মত অসহায় নারীদের জন্য বাংলাদেশ সরকার হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রি আইন-২০১২ প্রণয়ন করেছে যার গুরুত্ব অপরিসীম।

হিন্দুধর্মে সাধারণত শাস্ত্র অনুসরণ করে পুরোহিতের মাধ্যমে একজন ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এর তেমন কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। এটি সম্পূর্ণভাবে পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর টিকে থাকে। যেহেতু এধরনের বিয়ের কোনো দালিলিক প্রমাণ নেই সেহেতু অনেক সময় ছেলেমেয়ে উভয়পক্ষ বিশেষ করে নারীরা বিবাহ সংশ্লিষ্ট প্রতারণার শিকার হয়ে থাকে। উদ্দীপকের শীলা দাসের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

উদ্দীপকের শীলা দাস রতন কুমারকে বিয়ের তিন বছর পর জানতে পারে যে রতন কুমারের আগের একজন স্ত্রী ও দুইটি সন্তান আছে। রতন এখন তার পূর্বের স্ত্রীর কাছে ফিরে গেছে এবং শীলাকে ভরণপোষণ দেওয়া বন্ধ করেছে। এ ধরনের সমস্যা দূর করার জন্য বাংলাদেশ সরকার হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রি আইন-২০১২ প্রণয়ন করেছে। এর ফলে হিন্দুদের বিবাহ নিবন্ধনের মাধ্যমে সকল তথ্য প্রমাণাদি সংরক্ষণ করা হবে। এতে কেউ যদি প্রতারণার শিকার হয় তাহলে তথ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। কেউ প্রতারণা করলে ভুক্তভোগীর অধিকার আদায় বা প্রতারকের শাস্তির ব্যবস্থা করা যাবে। ফলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অধিকার বিশেষ করে হিন্দু নারীদের অধিকার সংরক্ষিত হবে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, শীলা দাসের মত অসহায় নারীদের অধিকার আদায়ে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রি আইন-২০১২ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ৩২ ফেসবুকে এক এমপির বিরুদ্ধে স্ট্যাটাস দেওয়ার অভিযোগে নবম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে থানায় এনে ওসি নির্যাতন করেন। ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে দণ্ড দেয়। বিষয়টি হাইকোর্টের নজরে এলে কোর্ট নিজ উদ্যোগে শিশুটির জামিন মঞ্জুর করেন। দণ্ড ছাড়াও নির্যাতনকারীদের হাইকোর্ট তলব করেন। *[বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. মাদকদ্রব্য নিরোধ আইন কার্যকর হয় কবে? ১

খ. সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল—ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে শিক্ষার্থীর অপরাধ কোন আইনের ধারা অনুযায়ী বিবেচ্য বিষয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এ ধরনের শিশুদের রক্ষায় এ আইনকে কতটুকু যথার্থ মনে কর? যুক্তি দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৯০ সালের ২ জানুয়ারি মাদকদ্রব্য নিরোধ আইন কার্যকর হয়।

খ সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য সামাজিক আইন প্রণীত হয়, ফলে এ দুটি বিষয় একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে। এ সব সমস্যা সামাজিক উন্নয়ন ও প্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন— যৌতুক একটি সামাজিক সমস্যা। এ ধরনের সমস্যা দূর করার লক্ষ্যেই সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয়। আবার আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হলে সমাজে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। অর্থাৎ সামাজিক সমস্যা ও আইন একে অন্যের পরিপূরক।

গ উদ্দীপকে শিক্ষার্থীর অপরাধ শিশু আইন ১৯৭৪ এর ধারা অনুযায়ী বিবেচ্য বিষয়।

১৯৭৪ সালের শিশু আইনে শিশুদের বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬ বছর। সাধারণত ১৬ বছরের কম বয়সী কিশোর অপরাধীদের বিচার শিশু আইন ১৯৭৪ এর ধারা অনুযায়ী করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে কিশোর আদালত স্থাপনের বিধান রাখা হয়। কিশোর আদালত মূলত অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কোনো শিশুর মামলার বিচার করবে। কিশোর আদালতের বিচারকার্য সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে মাতাপিতা এবং অভিভাবকদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করার বিধান রাখা হয়েছে। এ আদালতের লক্ষ্য হলো কিশোরদের সংশোধন করা।

উদ্দীপকে উল্লিখিত নবম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী ফেসবুকে এক এমপির বিরুদ্ধে স্ট্যাটাস দেয়। এক্ষেত্রে তার অপরাধের বিচার সাধারণ আইনের অধীনে করা যাবে না। কারণ ঐ শিক্ষার্থী একজন কিশোর তাই তার অপরাধের বিচার ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের বিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত কিশোর আদালতের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষার্থী কিশোর অপরাধী হিসেবে বিবেচিত। কিশোর অপরাধীদের রক্ষায় শিশু আইন ১৯৭৪ অত্যন্ত কার্যকর বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে শিশুদের হেফাজত, সংরক্ষণ, তাদের সঙ্গে ব্যবহার এবং কিশোর অপরাধীদের বিচার, শাস্তি ও অপরাধ প্রবণতা সংশোধনের জন্য শিশু আইন ১৯৭৪ প্রণীত হয়। বাংলাদেশের কিশোর অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে শিশু আইনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিশু আইন-১৯৭৪ এর বিধান অনুযায়ী ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে জাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিশোর আদালত, কিশোর হাজত এবং সংশোধন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে এটি গঠিত। অনুরূপ দ্বিতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যশোরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ি নামক স্থানে জাতীয় কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানও এ আইনের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া অপরাধী কিশোরদের বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর ফলে তারা পরবর্তীতে সমাজে পুনর্বাসিত হওয়ার সুযোগ পায়। এছাড়া বয়স্ক অপরাধীদের থেকে দূরে রাখার কারণে তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

শিশু আইন-১৯৭৪ কিশোর অপরাধ সংশোধনে অত্যন্ত কার্যকর হলেও বাস্তবায়নের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে এটি প্রত্যাশানুযায়ী ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

https://teachingbd24.com